সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ

যতদিন হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ, ততদিন মানুষ মাতৃগর্ভের। যেই না নিম্নপদ ঊর্ধ্বমুণ্ড, তখনই ভূমির। জীবনের এ এক অখণ্ড পৌনঃপুনিক প্রবাহ। সময়ের কোল থেকে সময়ই ছিটকে আসছে জীবদেহের মোড়কে। যেভাবে সমুদ্রের অতল থেকে বেলাভূমিতে ছুটে আসে সফেন কল্লোল, আবার নৃত্যপর স্রোত হয়ে ফিরে যায় সমুদ্রের কোলে, জীবনও তেমনিভাবেই সময়ের সফেন এক আন্দোলন। সেই আন্দোলনে মানুষই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা। মনুষ্যদেহভাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্তসার।

এ-উপলব্ধি যার, যে এক আশ্চর্য প্রথাবিরুদ্ধ চরিত্র। আর এই চমকপ্রদ চরিত্র নিয়েই সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কলমে এক দুঃসাহসিক প্রয়াস এই উপন্যাস। একদিকে তার স্বীকারোক্তিতে দেহবাদী ভোগবাসনার বহু অকপট বর্ণনা, অন্যদিকে তার ক্রমান্বয় উপলব্ধিতে জীবনের বহুতর তাৎপর্য উদঘাটন। রক্ষণশীলরা এ-লেখা পড়ে ছি ছি করে উঠতে পারেন, কিন্তু একে অস্বীকার করতে পারেন না। কোনারকের মন্দিরগাত্র বা খাজুরাহোর ভাস্কর্যের মতোই সম্ভোগচিত্র বুকে নিয়েও এ এক মহত্তর লক্ষ্যে উত্তীর্ণ শিল্পকর্ম॥

ISBN 81-7066-061-0

হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

জিনিসটা বেশ জমে উঠেছে। তা তো জমবেই বিশ বাইশ বছরের খেলা। চালে বেচালে জীবনের এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় অবস্থা। লিখতে জানলে জমজমাট একটা উপন্যাস লিখে ফেলা যেত। কে ছাপত তা অবশ্য জানি না। লেখার চরিত্র হওয়া সহজ, লেখক হওয়া সহজ নয়। বাইশ মণ তেলও পুড়ল না, রাধাও নাচল না। ডেলি দেড় বোতল পেটে ঢালতে হবে। ঢালতে ঢালতে মাথার ইঞ্জিন একদিন স্টার্ট নেবে, তারপর বেরিয়ে আসবে চোলাই করা জীবন-কাব্য। আমার সে ক্যাপিটাল নেই। লেখক আমি হতে পারব না। চরিত্র হয়েই ঘুরে বেড়াই।

আমার ছেলেটা প্রায় বখেই গেছে। মেয়েটা বেরিয়ে যাবো বেরিয়ে যাবো করছে। আমার স্ত্রী যেকোনও দিন পাগল হয়ে যেতে পারে। আমার টিমের একেবারে তছনছ অবস্থা। ফরোয়ার্ড লাইনে খেলছিলুম আমি। ডিফেনসে ছিল আমার স্ত্রী। ভালই খেলছিলুম। গোল করতে না পারলেও, ডিফেনসটা ভাল ছিল বলে গোল খাইনি। এইবার একেবারে পেড়ে ফেলবে। বোকার মতো চারতলার ওপর একটা ফ্ল্যাট কিনে যা পুঁজি ছিল শেষ করে ফেলেছি। এখন আমি কলে পড়া ইঁদুর। গালে দুটো চাল ফেলে চিবিয়ে এক গেলাস জল খেলে পিত্ত নিবারণ হয়, ফ্ল্যাট ধুয়ে তো আর পেট ভরবে না। টাকাটা ব্লক্‌ড হয়ে গেল। ব্যাঙ্কে থাকলে সময়ে অসময়ে খরচ করা যেত। সুদ পাওয়া যেত। এই চার তলায় বাতাস ছাড়া কিছুই নেই। আর এই ওনারশিপ ফ্ল্যাট এমন একটা জিনিস, ভাবলে হাসি পায়। জমির মালিক আমি নই। সে পড়ে আছে অনেক নিচে। কার্পেটের মত এক ফালি শূন্যে ঝুলন্ত ইটের খাঁচা, আমি তার মালিক। শূন্যকে এইভাবে যে কেনা যায় আমার জানা ছিল না। তবে সেখানেও গোলমাল। যে কোঅপারেটিভের ফ্ল্যাট, সেই কোঅপারেটিভের মেম্বারদের মধ্যে লেগে গেছে লড়াই। টাকা পয়সা মারামারির ব্যাপার। বাজারে লাখ লাখ টাকা দেনা। সেই দেনা শোধ করতে হবে। তার মানে আবার বেশ কিছু টাকার ধাক্কা।

বন্ধুগণ তোমরা কোথায়!

কেউ কোথাও নেইরে ভাই। কেবল আমি আছি। আর আমার পেছনে তেড়ে আসছে বেচালে পা ফেলার ইতিহাস। জীবন এমন এক বিশ্রী অঙ্ক। কষতে কষতে কোথাও একবার একটু ভুল হয়ে গেলে আর উত্তর মিলবে না। আর এ অঙ্ক একবারই কষা যায়। আবার তিরিশ বছর পেছিয়ে জীবনটা শুরু করতে পারলে অন্য রকম চেহারা হত। সে তো আর উপায় নেই। এখন খোলের বাইরে বেরিয়ে এসে নিজেকে দেখার কৌশল জানা থাকলে কি দেখতুম! একটা ধোপার গাধা পিঠে বোঝা নিয়ে টুকুস টুকুস চলেছে। চলেছে চলেছে। ছেলে বেলায় আমাদের বাড়ির রকে দুটো মাতাল রিকশাঅলা রাতে এসে শুত। তাদের মধ্যে একজন রাতে গল্প না শুনলে ঘুমোতে পারত না। আর একজন তাকে গল্প শোনাত। রাজপুত্র জঙ্গলের পথ ধরে চলেছে। বিহারী মাতাল সারা রাত ধরে বলেই চলেছে যাতে, যাতে, যাতে, যাতে আর শ্রোতা সারা রাত ধরে উত্তরই দিয়ে যাচ্ছে, হাঁ রে হাঁ রে। সেই রকম আমি গাধা, চলেছে চলেছে চলেছে। চলতে চলতে জীবনের মাঝমাঠ পর্যন্ত চলে গেছে। জীবন যদি সত্যই উপন্যাস হত, তাহলে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে লিখতুম।

প্রথমে যা করতুম তাহল নীপার সঙ্গে নিজের বিয়েই দিতুম না। জীবনে সুন্দরী বউয়ের মতো যন্ত্রণা আর দুটো নেই। আবার সে বউ যদি এক সময়ের ছাত্রী হয়। গুরুর আসন থেকে টলে স্বামীর আসনে নেমে এলে গুরুর ইজ্জত তো গেলই, স্বামী হিসেবেও অপভ্রংশ হয়ে গেল। শিক্ষক থেকে সেবক। দাতা থেকে ভিখারি। সেই সময় অনেকেই বারণ করেছিলেন। এমন কাজটি করো না। বাঙালির ছেলে চাকরিবাকরি করছ। একবার ঘণ্টা বাজালেই শয়ে শয়ে মেয়ের বাপ তোমাকে ছিঁড়ে খাবে। আর দেনা-পাওনার ব্যাপারে একটু উদার হলে তুমি হপ্তায় হপ্তায় বিয়ে করবে। গাধা কোথাকার! এমনি গাধার তো অসুবিধে নেই গাধা হয়েই জন্মেছে। মানুষ গাধা হয়ে গেলে, পরে তার বোধোদয় হয়, তখন আর পিঠ থেকে বোঝা নামাবার উপায় থাকে না। সে যে কি জ্বালা।

নীপার সঙ্গে যখন আমার এই সব হচ্ছে তখন বয়েস কম। ঠোঁটের ওপর নব-কার্তিকের মত সরু গোঁফ। সেইটাকেই পরে চওড়া করে আর দেহে একটু ঢ্যাপসা হয়ে বিশ্বকর্মা হয়েছিলুম। মেয়ে যদি দেখতে শুনতে চটকদার হয়, আবার সে যদি একটু দিলখোলা দিলদার হয়। হয়ে গেল। সে একেবারে ফোটা ফুল। সারাদিন তাকে ঘিরে কত ভ্রমরের যে ভ্যাঁমোর ভ্যাঁমোর। এমন মেয়েকে একলা করে নিজের কাছে নিয়ে আসা, শুধু বিয়ে নয়, জয় করা। গোঁদো পিপড়ে ছাড়িয়ে মুখে বাতাসা ফেলার মতো।

কি থেকে যে কি হয়, কি হতে পারে, সে বোধটাই তখন আচ্ছন্ন। সেই সময়

ওই গানটি ছিল খুব পপুলার। ও দয়াল বিচার কর আমায় গুণ করেছে, আমায় খুন করেছে/ আমায় গুণ করেছে, খুন করেছে ও বাঁশী। আর নীপার তখন ফর্ম কি! চিকন কালো চুলের ঢল কোমরটোমর ছাপিয়ে, হাঁটু পেরিয়ে প্রায় গোড়ালি ছুঁই ছুঁই। বেতসের মতো দেহ। বাঙালী মেয়ের এমন হাইট সচরাচর দেখা যায় না। হাতদুটো যেন মৃণালের লতা। পান পাতার মতো মুখ। চিবুকের কি শোভা! টিকলো নাক। আর ওই চোখ দেখেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল। নায়িকা হবার জন্যেই নীপার জন্ম। যত সুন্দরীই হোক, কোথাও না কোথাও একটা খুঁত থাকেই। বাইরে না থাকলেও ভেতরে থাকে। যেমন দাঁতে। নীপার দাঁত দুপাটি যেন মুক্তোর মালা। পাশাপাশি সেট করা। হাসলে মনে হত অজ্ঞান হয়ে যাই। সুন্দরী মেয়েরা সাধারণত ভোঁদা মতো হয়। রূপের অহঙ্কারে গোবদামুখো। নীপা ঠিক তার উল্টো। যেমন ছিল তার সেনস অফ হিউমার, তেমনি ছিল ইনটেলিজেনস। যেমন হাসতে পারত তেমনি হাসাতে পারত। স্বাদেগন্ধে অতুলনীয় দার্জিলিং চায়ের মতো নীপা।

এমন মেয়েকে পড়ানো যায়! প্রেমে পড়া যায়। নীপাদের ফ্যামিলির বেজায় বদনাম ছিল। নীপার বাবা বিদেশে চাকরি করতেন। প্রায় ফুটছয়েক লম্বা। দারুণ স্বাস্থ্য। মুখে সবসময় একটা হাসি হাসি খুশি খুশি ভাব। এক মাসের ছুটিতে আসতেন। আবার চলে যেতেন। পরের ছুটিতে এসে দেখতেন একটি মেয়ে হয়েছে। ভদ্রলোক মোট এগারটি কন্যার পিতা হয়ে সগর্বে হাসিহাসি মুখে ঘুরে বেড়াতেন। সকালের সাজ ছিল ফুলছাপ লুঙ্গি, স্যান্ডো গেঞ্জি। বুকের কাছে দোল খেত কামরূপ কামাক্ষার কোনও এক তান্ত্রিকের দেওয়া বাঘের নখ। রূপোর চেনে বাঁধা। বিকেলের সাজ ছিল পাজামা আর সিল্কের পাঞ্জাবি। ভদ্রলোক ডজনে উঠতে পারতেন; কিন্তু তাঁর স্ত্রীর মা হবার কাল জৈবিক নিয়মেই ফুরিয়ে গেল। নীপার মাকে দেখলে মনেই হত না, এগারটি মেয়ের মা। চেহারায় এমন একটা চটক ছিল। আসলে যে কোনও কাজই প্রফুল্ল চিত্তে করলে শরীর ভাঙে না। আর বলে না, বুড়োরা তরুণীদের সঙ্গে মেলামেশা করলে যৌবন অনেকদিন ধরে রাখতে পারেন। মেয়েদের বেলায় উল্টোটা। নীপার মা উঠতি বয়েসের ছেলেদের সঙ্গে প্রাণ খুলে, শরীর খুলে মিশতে পারতেন। এই সিনেমায় যাচ্ছেন, থিয়েটারে যাচ্ছেন। ঘরে বসে আড্ডা মারছেন। পান খাচ্ছেন। অনেকে বলতেন, পান করছেন। খাটে শুয়ে আছেন। এ পাশে একটা। পায়ের কাছে আর একটা। সে সব দেখার মতো দৃশ্য। রক্ষণশীলরা আঁতকে উঠবেন। সেকাল হলে সমাজনেতারা বিধিমত ব্যবস্থা

নিতেন। একালে সমালোচনাই হয়। নীপাদের সম্বন্ধে যাঁরা খারাপ খারাপ কথা বলতেন, তাঁরা ইচ্ছে করলেই নীপার মায়ের আখড়ায় গিয়ে ঢুকতে পারতেন। কোনও বাধা ছিল না। ভদ্রমহিলার তেমন বাছবিচার দেখিনি। মণি স্যাকরা সেও আসছে, কয়লার দোকানের মালখোর সুব্রত সেও আসছে। গয়লা লছমন সেও আসছে, আবার যুবনেতা অমরেশ সেও আসছে। সর্বধর্ম সমন্বয়। বাড়িটা যেন ধর্মশালা। তীর্থস্থান। মজা এই, শাসন নেই, বিধিনিষেধ নেই, অথচ মেয়েগুলো টপাটপ পাশ করে যাচ্ছে। ভাল রেজাল্ট করছে। কেউ গাইছে। কেউ নাচছে। অতগুলো মেয়ে এক বাড়িতে, অথচ নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি নেই। যেন পাখির বাসা। গান, নাচের বোল, ঘুঙুরের শব্দ, গলা ছেড়ে পড়া মুখস্থ, সারাদিন সে এক দেখার জিনিস। মানুষ ভালটা তো দেখতে পায় না। টেনে টেনে খারাপটাই বের করে আনবে। কেউ একবার ভেবে দেখলে না, কেন নীপার মাকে যে জানে না, সে নীপার বোন বলে ভুল করে। বয়েসটাকে এইভাবে ধরে রাখতে জানার কৌশলটা কি! পাড়ায় আরও তো সব উদাহরণ ছিল এক ছেলের মা যেন দিদিমা! তিরিশ না পেরতেই অ্যানিমিয়া। চল্লিশেই চালসে। হরি দিন তো গেল। পঞ্চাশে টিকটিকির ন্যাজের মত চুল। ব্যাঙের মতো দেহত্বক। কপালে ভাঁজ। মুখে খড়ি। বিবাহিতরাই নীপাদের বেশি নিন্দে করত তার কারণটা মনে হয় নিজেদের বউ। কুড়িতেই সব বুড়ি। ময়লা ময়লা শাড়ি, রঙচটা ব্লাউজ। চুলের কোনও যত্ন নেই। পাশ দিয়ে চলে গেলে গন্ধ বেরোয়। পায়ের গোড়ালি ফাটাফাটা, ছ্যাতলা ধরা। বাইরে যাদের এই অবস্থা তাদের অন্তর্বাসের কথা চিন্তাই করা যায় না।

নীপার মা ছিলেন একেবারে অন্যরকম। আমি একবার তাঁর চুল শুকোবার কায়দা দেখেছিলাম। আমরা তখন থিয়েটার, ফাংশন এই সব করি। সংসারে ঢোকার আগে সব ছেলেমেয়েই একটু সংস্কৃতি করে, প্রেম করে, কবিতা লেখে। এই হল নিয়ম। যেমন সব মানুষই শৈশবে বিছানা ভিজোয়। দিন নেই রাত নেই নীপাদের বাড়িতে আমাদের রিহার্শাল চলেছে। সেই সময় নীপার মাকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। নিজের মনের কথা মানুষ সহজে প্রকাশ করতে চায় না। যা করে, যেটুকু করে সেটা মোটেই মনের নয়, ব্যবহারিক জগতে কাজ আদায়ের কথা। একমাত্র রেগে গেলে মন কিছুটা বেরোয়, সেটা হল অন্যের সম্পর্কে নিজের ধারণা। নিজের প্রকাশ নিজে করার সাহস থাকলে, আমি বলতুম নীপার মাকে আমার ভীষণ ভাল লেগেছিল। যে বয়েসের কথা বলছি, সে বয়েসে মানুষ কোনও কিছুকেই পাপ বলে মনে করে না। পাপের চিন্তা আসে পরে, যখন রক্তের জোর কমে যায়। যখন মানুষ

অভ্যস্ত জগতে দীনহীনের মতো একটু আশ্রয় খোঁজে। বেপরোয়া ভাবটা যখন আর থাকে না। সব কাজেরই যখন সামাজিক সমর্থন খুঁজতে হয়, যখন চারপাশ থেকে তেড়ে আসতে থাকে নানারকম ভয়।

সেই সময় একদিন।

বেলা একটা নাগাদ আমাদের রিহার্শাল শেষ। নীপা বললে, আজ আপনি আমাদের এখানেই খাওয়াদাওয়া করে যান। তখন নীপা আমাকে আপনিই বলত। সবে স্নান করে এসেছে। ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। ভুরু চোখের পাতা সিক্ত। গামছা দিয়ে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে খাবার কথা বললে। নীপা আমার কাছে এমনিই লোভনীয়, তার ওপর তার ওই একান্ত ঘরোয়া ভঙ্গী। শাড়ি পরার আলগা ধরন। ভালমন্দ এমন কিছু খাওয়াতে পারবে সে আশা নেই। অত বড় সংসার। পোস্ত, বিউলির ডাল আর ঢ্যাঁড়শ, এর বেশি কি আর জুটবে! খাওয়া নয় নীপাই আমার আকর্ষণ, তার চেয়েও বড় আকর্ষণ নীপার মা। রাজি হয়ে গেলুম।

অনেকক্ষণ থেকেই সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে আসছিল। যে ঘরে বসেছিলুম সেই ঘরটা ক্রমশই ধোঁয়ায় ভরে উঠছিল। পুজো হচ্ছে, পুজো হবে কেন? আমাদের বাড়িতে ধর্মটর্ম হয় না, মায়ের চুল শুকনো হচ্ছে।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। নীপার মা শুয়ে আছেন উঁচু খাটে। পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে মাথার চুল। তলায় একটা মাটির পাত্রে টিকের আগুন। সেই আগুনে পুড়ছে ধুনো গুগগুল আর চন্দন। রেশমের মত নরম চুল বেয়ে সাপের মত সুগন্ধি ধোঁয়া উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে।

নীপার মা বললেন, বোসো না এখানে।

বুকটা কেমন করে উঠল। একেবারে খাটে, তাঁর পাশে বসার আহ্বান। নীল ডুরে শাড়ি। সাদা ফিন ফিন ব্লাউজ। চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রঙ। ফর্সা গালে ছোট্ট একটা কালো তিল। পাগল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। পরে বুঝেছিলুম, আমরা সকলেই মন দিয়ে জগতটাকে দেখি। আসল রূপ, অবিকৃত রূপ তাই ধরা পড়ে না। কোটি মানুষের কোটি জগৎ। নীপার মা আমাকে হয়তো খুব ভাল মনেই বসতে বললেন, আমি কিন্তু বসে মোটেই স্বস্তি পেলুম না। তখনকার মনের সেই অবস্থাটাকে তখন আমার পাপ বলে মনে হয়নি। মনে হয়েছিল সুযোগ। একটা আহ্বান। আমি বসেছিলুম ডানদিকে শরীরে শরীর ছুঁইয়ে। নীপার মা ডান পাটা হাঁটুর কাছ থেকে ভাঁজ করে তুলে আমার পিঠে ঠেকিয়ে দিলেন। নরম উরুর ঘন জগতে আমার পিঠ ডুবে গেল। সে যে কি শিহরণ। মহিলার বয়স আমার দ্বিগুণ। বিবাহিতা। অভিজ্ঞা। এই ভাবনাতেই

আমার রোমাঞ্চ। কাঁচপোকা যেন আরশোলা ধরেছে। নীপার মা পাটাকে এদিক ওদিক করছেন আর আমি দুলছি। আমার জগৎটাই দুলছে। অথচ বাইরে সবকিছুই স্বাভাবিক। নীপা বারান্দায় শাড়ি শুকোতে দিচ্ছে। সেও বড় কম আকর্ষণীয় দৃশ্য নয়। নীপার দিদি ভিজে চুলে ভিজে গামছা জড়িয়ে এঘর ওঘর করছে। পরের বোনটা একেবারে ছোটটাকে ভাত খাওয়াচ্ছে। কারুর কিছুই মনে হচ্ছে না, অথচ আমি মরে যাচ্ছি। আড়ে আড়ে তাকাচ্ছি নীপার মায়ের দিকে। আমার চোখে রাত নামছে। জানালা দরজা বন্ধ হচ্ছে। আলো নিবছে।

এখন আমি ভাবি, নানা রকম বই পড়ে সমর্থনও পেয়েছি, আমি অসুস্থ। আমার রক্তে পাপ আছে।

আমার সুন্দর চেহারা বাইরে থেকে সুন্দর মনে হলেও ভেতরটা ক্ষত চিহ্নে ভরা। পক-মার্কড। আমার জীবন স্বাভাবিক হতে পারে না। এ বোঝা বয়সের বোঝা। যৌবনে এসব বুঝিনি। আমার আত্মীয়স্বজন যত ছিছি করেন আমার ঘোর তত বাড়তে থাকে। একে একে সবাই আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। আমার যেন দুরারোগ্য বসন্ত হয়েছে। সব সরে সরে যাচ্ছেন। প্রতিনিধি মারফত বলতে লাগলেন—সুখী হবে না, সুখী হবে না। বিপদে পড়বে। জ্বলে পুড়ে মরবে। ওদের ওটা সংসার নয়। ওটা কামরূপ কামাখ্যা। তুকতাক জানে। বশীকরণ জানে। মহিলাটি আসলে কিন্নরী। শাস্ত্রে অমন মহিলার উল্লেখ আছে। যেখানে যত আত্মীয়স্বজন আছেন, সব ছুটে এলেন, ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে। এক ডজন মায়াবী ছেলেটাকে চুষে খাচ্ছে।

নীপা সপ্তাহে তিন দিন আমাদের বাড়িতে আসত পড়তে। এ বাড়িতে কি হচ্ছে তার জানার কথা নয়। নীপাকে আমি বিয়ে করতে চাই, এ কথা কোনওদিন মুখ ফুটে বলিনি। অথচ সবাই গেল গেল করছে। নীপাকে ভাল লাগে তার মানে এই নয় আমি বিয়ে করব। আত্মীয়স্বজনরা ওই ভাবে আদা জল খেয়ে আমাকে বাঁচাবার জন্যে না নামলে আমি এই ভাবে মরতুম না। আমাদের বাড়িতে নীপার পড়তে আসা বন্ধ হয়ে গেল। আমি কিন্তু সত্যিই তাকে পড়াতাম। আমার ভেতরে যাই থাক না কেন, শিক্ষক হিসেবে খারাপ ছিলুম না। বরং ভাল লাগত বলেই প্রাণ ঢেলে তাকে পড়াতুম। আমার যত কামনা সব বেরিয়ে আসত সংযমের গাম্ভীর্য হয়ে। আমি ভেতরে কি ভাবছি নীপাকে কোনওদিন বুঝতে দিইনি।

তবে অসংযম অনেকটা ড্যামের মতো, জলাধারের মতো। সময়মতো স্লুইসগেট খুলে কিছুটা বের করে দিতে না পারলে ফেটে বেরিয়ে যায়। আমার বেলায় তাই হল। যাই বলি না কেন, মনে মনে আমি নীপাকে ভোগ করতুম।

আমার মনের মুঠোয় সে ধরা ছিল। যেমন খুশি যেভাবে খুশি তাকে ব্যবহার করতুম। নীপা যেন আমার বাতের ব্যথা। সব সময় গাঁটে গাঁটে ঘুরছে। সেই নিয়েই চলাফেরা কাজ কর্ম। কারুর বোঝার উপায় নেই, লোকটা আড়ষ্ট একটা ব্যথা নিয়ে, ঘিন ঘিনে একটা যন্ত্রণা নিয়ে কেমন ঘুরছে।

সে ছিল দোলের দিন।

ঘটনাটা ঘটে গেল আমাদেরই বাড়িতে। তিনি, মানে সেই ঈশ্বর যখন কিছু ঘটাবেন তখন পথ পরিষ্কার করে রাখবেন। লোভ দেখাবেন। অদৃশ্য ফাঁদ পেতে রাখবেন। অদৃষ্টের সুতো ধরে টানবেন। সেই ফাঁদে পড়ার নামই ভাগ্য। পরে এক প্রাচীন রাজার জীবনী পড়তে গিয়ে দেখেছিলুম—তিনি স্পষ্ট লিখছেন—ক্যারেকটার ইজ ডেসটিনি। চরিত্রই ভাগ্য। চরিত্রই নিয়তি। আবার ওই নীপাকেই একদিন অ্যারিস্টটল পড়াতে গিয়ে দেখেছিলুম—তিনি বলছেন—আওয়ার ক্যারেকটারস আর দি রেজাল্ট অফ আওয়ার কন্ডাক্ট। আমরা যা করে ফেলি তার ফলই হল চরিত্র। সোজা কথা তবে কে আর অত ভাবছে। ঘটনার সামনে এসে কে আর পা ছড়িয়ে ভাবতে বসে, নোভালিস কি বলেছেন, কি বলেছেন অ্যারিস্টটল। চরিত্রই ভাগ্য আর আচরণই চরিত্র। আর সব ঘটে যাবার পর ড্রাইডেনের মতো বলতে হয়—অল হিউম্যান থিংস আর সাবজেক্ট টু ডিক্লে। অ্যান্ড হোয়েন ফেট সামনস মনার্কস মাস্ট ওবে। মানুষ মরবেই আর ভাগ্য যখন কান ধরে টানবে তখন পরাক্রান্ত নৃপতিরও নিস্তার নেই।

আমাদের বাড়ির বড়কর্তারা ছিলেন বড় মজার মানুষ। ন্যায়, নীতি, আদর্শ ধর্ম এই সব বলে নৃত্য করতেন, আবার সুযোগ পেলেই ছোটখাট পাপও করতেন। দোলকে মহা উল্লাসে ওঁরা বলতেন ফাগুয়া। সেদিন একটু নেশাটেশা চলত। সকাল থেকেই শুরু হয়ে যেত গানবাজনার আসর। মাঝেমধ্যে পশ্চিমী ওস্তাদেরা এসে হাজির হতেন। দখিনা বাতাস, ঠুংরির মোচড়, তবলার বোল, সব মিলিয়ে বাড়ি যেন বৃন্দাবন। সেদিন সব অনাচারই দেখা হত ক্ষমার চোখে। অফুরন্ত খাবার আর পান, পানীয়ের ব্যবস্থা। গরম গরম তেলেভাজা, পাকড়ো, ঘি চপচপে হালুয়া। সারা বছর যাঁদের মুখ গম্ভীর গোবদা, মনে হত ও মুখে হাসি আর ফুটবে না, সেই সব মুখের কি চেহারা সেদিন। অফুরান রসিকতা, অনর্গল হাসি। চরিত্রবান, কট্টর মানুষেরা প্রগলভ হলে কেমন যেন লাগে। কুলবধূ হঠাৎ খেমটা নাচলে যেমন হয়। তা ফাগুয়ার দিন গেলাস গেলাস সিদ্ধির কল্যাণে আমাদের বাড়ির বাঁধন আলগা হয়ে যেত। মুখে জর্দাপান ঠুসে বেনারসী ঘরানার মহিলা শিল্পী আদিরসাত্মক ঠুংরি ধরতেন। তাঁর বুক থেকে আঁচল খসে পড়ত।

পুরুষ্ট গর্দানে সোনার মটরদানা হার। মাথা নাড়াবার তালে তালে কানের ঝুমকো দুল টিংলিং করত। নাকের ডগায় চিনির দানার মতো জর্দা ঘাম। গোল গোল পুরু পুরু হাতে সোনার চুড়ি আর বালা। গানের কি লচক। গজলের জোর দেবার সময় দেহের কি দুলুনি, হাতের কি ভঙ্গী। কর্তাদের দেখে মনে হত, কান দিয়ে কেন চোখ দিয়ে গান শুনছেন। সংসারের নারী সেবা করে তার বেশি নয়। নারী যে রূপে মোহিনী তার জন্যে হাত বাড়াতে হয় সংসারের বাইরে। মানুষ অনেক কিছু চাপতে পারে কাম চাপা বড় কঠিন। প্রথম রিপু। প্রবল রিপু। আড়ালে আবডালে মধ্যরাতের মশারির লীলাভূমিতে বাঘ বেরোয় চাপা হুঙ্কারে তাই শিকারির খোঁজ পড়ে না ম্যানইটার মারার জন্যে।

পাছে বড়দের ওপর অশ্রদ্ধা আসে, তাই ফাগুয়ার আসর থেকে আমি পালিয়ে থাকতুম। এক বছর নেশার ঘোরে আমাদের এক ফ্যামিলি ফ্রেন্ড চেপে ধরেছিলেন তোমাকে নাচতে হবে। সে এক ঝুলোঝুলি ব্যাপার। উদয়শঙ্কর যদি নাচতে পারেন তুমি কেন পারবে না ছোকরা। সেই থেকে আসরে আর ভুলেও উঁকি মারি না।

চিলেকোঠায় আমার একটা আস্তানা ছিল। সেই ঘরটা ছিল সংসারের গুদামখানা। ভাঙা বেতের চেয়ার, ছেঁড়া লেপ, তোশক, সতরঞ্চি, দড়িদড়ার সমাধিক্ষেত্র। কাঁচ ভাঙা ছবি। লণ্ঠন। একটা অবহেলিত ঝাড়বাতি। এই ঘরেই ছিল বেশ বড় মাপের একটা ছবি। কোনও এক সুন্দরী মহিলার। আমাদেরই কোনও আত্মীয়ার আত্মীয়া। সম্পর্কের শিকড় কোথা থেকে কোথায় যে চলে যায়। কাঁচ ভাঙা ছবিটাকে ঝেড়েঝুড়ে আমিই এক কোণে খাড়া করে রেখেছি। ছোট ছোট সাদা সাদা দাগ ফুটেছে। মুখটা কিন্তু অক্ষত ছিল। এ ঘরে যখন নির্জনে এসে বসতুম তখন ওই ছবির মেয়েটি আমাকে তার জীবনকাহিনী শোনাত। ছবি শোনাত না, আমি বসে বসে বানাতুম। মেয়েটির নাম তন্দ্রা। যার অমন ঢুলু ঢুলু চোখ তার নাম তন্দ্রা না হয়ে অন্য কিছু হতেই পারে না। তন্দ্রা, পাটনার রাভেনশ কলেজে পড়ত। পাটনায় ওই নামের কোনও কলেজ আছে কিনা জানি না। তবে তন্দ্রার যে রকম সুন্দর ফিগার তাতে বিহারেই তার মানুষ হওয়া উচিত। আর র‍্যাভেনশ কলেজ যেখানেই থাক সেখানেই সে পড়েছে ফিলজফি নিয়ে। তন্দ্রা খুব ভাল গান গাইত। ইন্টার কলেজিয়েট কনটেস্টে ভজনে প্রথম হয়েছিল। তন্দ্রা পঞ্চাশ সালে পুরীর সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে ডুবে মারা যায়। তার দেহ আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ডুবে যাবার তিন দিন পরে চক্রতীর্থের কাছে একটা ফিকে হলুদ শাড়ি ভেসে এসেছিল। তন্দ্রারই শাড়ি। ওইটা পরে জলে নেমেছিল। সেদিন ছিল শ্রাবণ পূর্ণিমা।

চিলে কোঠার দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। এক ঝলক ঠুংরির বোল ভেসে এল, পিয়া না মানত মানা। বেশ জমেছে। ঠুংরি শুনলেই মনে হয় আমি সাজাহান। ভরা চাঁদের আলোয় নিজের তৈরি তাজমহলের জাফরির ছায়ায় ছায়ায় মমতাজের প্রেতাত্মাকে খুঁজছি।

দরজার দিকে পেছন ফিরে সামনে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে নীপা। টকটকে লাল আবির মাখা মুখ। বড় বড় নীল দুটো চোখ। সাদা শাড়ি। সেই শাড়িতে যারা রঙ মেরেছে তারা বেশ হিসেব করেই মেরেছে। মেয়েদের সব চেয়ে ভালো লাগার জায়গাগুলোই ভিজিয়ে দিয়েছে। আমরা যেমন পড়তে পড়তে লেখার বিশেষ বিশেষ অংশে পেনসিলের দাগ মারি। নীপাকেও সেইভাবে কামুকেরা পিচকিরির রঙ মেরে কায়দা করে ছুপিয়ে দিয়েছে। আবীরে আতর ছিল। সেই আতরের গন্ধে চিলেকোঠা ভরে উঠেছে।

নীপা পেছন দিকে হাত বাড়িয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। চারপাশের কাঁচের শার্সি ফুঁড়ে রোদের আলো ঢোকায় ঘরটাকে মনে হচ্ছে পাকা পিচ ফল। নীপার ব্লাউজের সামনের হুকটা ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। কেউ জোর করে বুকের ভেতর হাত ঢুকিয়েছিল। ঢোকাতেই পারে। শ্যামকুঞ্জে কৃষ্ণের অভাব নেই। নীপার বাবার নাম শ্যামবাবু। পাড়ার লোকেরা ব্যঙ্গ করে বলে শ্যামকুঞ্জ। সেই কুঞ্জে খোকা থেকে বুড়ো সব কৃষ্ণেরই আনাগোনা। ওদিকে নীপার মায়ের কি অবস্থা কে জানে। ফাগুয়া হল কামোৎসব। মানুষকে স্যাডিস্ট করে তোলে। এই যে শীত আর গ্রীষ্মের সন্ধিক্ষণ বছরের এই সময়টায় মানুষের মিলনেচ্ছা প্রবল হয়।

দরজায় পিঠ রেখে নীপা বললে, 'রঙের ভয়ে লুকিয়ে বসে আছেন?'

আমি বসেছিলুম মেঝেতে বহুকালের পিঁজে যাওয়া একটা কার্পেটের ওপর। আমার চোখের সামনে আড় হয়ে আছে শাড়ি জড়ানো নীপার সুগঠিত দেহ। দেখতে পাচ্ছি, উদার অনাবৃত কোমর হারিয়ে গেছে ধাপে ধাপে অন্তর্বাস আর শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে। ক্ষীণ থেকে স্ফীত, শেষে মৎস্যকন্যার পুচ্ছের মতো নেমে গেছে লাল মেঝের দিকে। আর এক আকাশে যেন চোখ মেলেছি।

দপ করে আগুন ধরে গেল শুকনো বারুদে।

ঠুংরির হালকা রেশ—পিয়া না মানত মানা।

আবীরের আতরের গন্ধে।

ঘরের সোনালী উষ্ণতা।

মোরাবাদী কাজকরা বিশাল এক ফুলদানী ঘরের কোণে কাত হয়ে আছে।

ভাঙা একটা সিংহাসন চেয়ার।

তে ঠেংয়া দাঁড়া টেবিল ল্যাম্প মাথায় লাল টুপি।

আমার চোখের সামনে নীপার সুগভীর নাভি। আবীরের অভ্রচূর্ণ আলোয় চিকচিক করছে।

আমি নীপাকে পড়াই। আমার ছাত্রী। আগুনে আদর্শের জল ঢালার চেষ্টা।

শুকনো গলায় বললুম, 'ভয়েই বলতে পারো। রঙ মাখলে তুলতে অনেক সময় লাগে। তুমি এলে কি ভাবে।'

নীপা তার মুক্তর মতো সাদা দাঁতে হাসল, 'কেন হেঁটে হেঁটে। ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙে।'

'তোমার সাহস আছে।'

'তা আছে। দেখি পা দেখি। আপনি আমার গুরুজন।'

আমি বসে আছি। নীপা এগিয়ে আসছে। দরজা থেকে আমার ব্যবধান তিন চার হাত। এগিয়ে আসছে নীপার ক্ষীণ কোমর। গভীর নাভী। নিতম্বের ছন্দ। তেজপাতার মতো পাতলা দুটি পায়ের পাতা। রমণীর শরীরের যে গোপনস্থলে ধরাধামে আসার আগে আমার দশমাস দশ দিনের দীর্ঘ রাত্রিবাস হয়েছিল সেই পবিত্র স্থানটি ক্রমে এগিয়ে এল চোখের সামনে। শাড়ির ভাঁজ। লাল রঙ। কুমারী শরীরের উত্তাপ। আতপ ধানের গন্ধ। প্রচণ্ড আবেগে আমি স্তম্ভিত।

নীপা আমার পায়ের কথা ভুলে গেল। দু হাতে আমার মাথায় আর মুখে মাখাতে লাগল সুগন্ধী আবীর। অভ্রচূর্ণ চিক চিক করে ঝরে পড়ছে আমার কোলে। রিনিঠিনি বাজছে তার দু'হাতের কাঁচের চুড়ি। নীপা কোনও দিনই আমাকে রাশভারি শিক্ষকের আসনে বসাতে পারেনি। বন্ধুর ভূমিকাতেই দেখতে চেয়েছিল।

আমার চুল মুঠোয় ধরে মাথাটাকে চেপে ধরল তার নরম তলপেটে।

আণবিক বিস্ফোরণের কথা শোনা ছিল। বিজ্ঞানী জানেন কিসের সঙ্গে কি মিশলে, হিরোসিমা, নাগাশাকির মতো শহর মুহূর্তে মিলিয়ে যায় স্বপ্নের মতো। একটা ঘণ্টা কোথা দিয়ে কি ভাবে বাষ্প হয়ে উড়ে চলে গেল। আদর্শ, চরিত্র, ভয়, সংস্কার সব, সব মনে হল হীনবল ভ্রান্তি। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে নিমেষে তাদের নিজেদের জগৎ তৈরি করে ফেলতে পারে। যৌবনই স্রষ্টা, যৌবনই ঈশ্বর। বাইবেল : অ্যাণ্ড আই স এ নিউ হেভেন অ্যাণ্ড এ নিউ আর্থ।

নীপা আর আমার ছাত্রী নয়। আমি আর শিক্ষক নই। তার জামার সব কটা হুক শ্বাসপ্রশ্বাসের উত্থান পতনে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। বক্ষবন্ধনী ছুঁড়ে দিয়েছে ঘরের কোণে। গিয়ে আটকেছে আমার সেই নাম না জানা মহিলার ছবির মাথায়। শুভ্র, শালীন একটি দীর্ঘ দেহ। থরথর কাঁপছে। ভয়, আনন্দ, প্রথম অনুভূতি। অস্ফুট আর্তনাদ। দংশন। এ নিউ আর্থ। শাড়ির রঙ, শুভ্র ত্বকের

জায়গায়, জায়গায় ফুটে আছে। ওঁরা বলেন, দর্শন। জীবন দর্শন, ভগবদ্‌দর্শন, সত্য দর্শন। আমি যা দেখছি, তার চেয়ে বড় দর্শন আর কি আছে?

আমার জানা ছিল না, এই রকম হয়। নীপারও জানা ছিল না, শরীর কি সুরে কেমন করে বেজে ওঠে। ছিঁড়ে, খুঁড়ে, দুমড়ে মুচড়ে একটা ঝড় বয়ে গেল। সব এলোমেলো। নীপার শরীরের রঙে আমি লাল। নীপার শরীর হয়ে উঠেছে অলিভের মত মসৃণ। কি সুন্দর দেখাচ্ছে নীপাকে। বহু বহু দিনের ক্ষরায় ফুটিফাটা শুষ্ক জমিতে যেন প্রথম বর্ষার জল পড়েছে।

হাতের ওপর মাথা রেখে নীপা শুয়ে আছে। ঘামে শরীর ভিজে ভিজে। অদ্ভুত এক সুখের আয়েসে চোখ আধবোজা। চুলে ঢাকা ছোট্ট কপালে হাত রেখে বললুম, ওঠো।

নীপা বললে, কি হল? বদমাশ।

খুব আদুরে গলাতেই বললে। তবু ওই বদমাশ শব্দটা মনে হল চাবুক। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেল। লজ্জায়, ঘৃণায় আমি কুঁকড়ে গেলুম। আমার শিক্ষা আমাকে উপহাস করছে। আমার বংশ মর্যাদা আমাকে উপহাস করছে। আমার আদর্শ আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসছে। আমি পরাভূত। নীপার সামনে আর আমি কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো না।

নীপা আমাকে টেনে তার পাশে শোয়াতে চাইল। এখনও তার ঘোর কাটেনি।

তুমি এবার যাও। যে কেউ যে কোনও মুহূর্তে এসে পড়তে পারে।

আসুক।

সে কি? এই অবস্থায় দেখলে কি ভাববে?

কে দেখতে বলেছে? স্বার্থপর। বদমাশ। তুমি আমার কি করেছ জানো। আমি যাব না।

নীপা পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। আমি তার দখলে এসে গেছি। বাঘিনী ধরেছে শিকার। আর সেইদিনই বুঝলুম, পায়ের জুতোরও কি সুখ! তাই আনন্দে মশমশ করে।

পরের দিনই আমি দিল্লি চলে গেলুম, ইউ পি এস সির ইন্টারভিউ দিতে। সারাটা পথ আমি নীপার কথা ভাবলুম। আমি পাপ করেছি, সেই বোধটা আর রইল না। আমি পেয়েছি, আমি পূর্ণ হয়েছি। আমার অবস্থা চৈত্রের কাকের মতো। ঠোঁটে খড়কুটো নিয়ে উড়ে উড়ে চলেছি। গাছের উঁচু ডালে বাসা বাঁধব। নীপা ছাড়া পৃথিবীতে আর আমার কেউ কোথাও নেই। ট্রেনে যার দিকে তাকাচ্ছি তাকেই যেন ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। আমার সঙ্গে চলেছেন,

ব্যাণ্ডেলের এক পরিবার। বাবা, মা, তরুণী মেয়ে, আর এক সৌম্য বৃদ্ধা। যেমন হয় অল্প সময়ের মধ্যেই আলাপ জমে উঠল। বেশ হাসিখুশি পরিবার। প্রাচুর্যেই আছেন। চেহারা দেখে সেই রকমই মনে হয়েছিল।

আমি আমার সেই বয়েসটায় লক্ষ্য করেছিলুম, যে সব পরিবারে মেয়ে বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠছে, সেই সব পরিবারের অভিভাবকরা অকারণে ভীষণ খাতির শুরু করতেন। অকারণ হয়তো নয়। আমি শুনেছি, শয়তানকে নাকি ঈশ্বরের চেয়েও সুন্দর দেখতে। বিলিতি শয়তান নয়। বিলিতি শয়তানের মাথায় দুটো শিং আছে। আর তার পায়ে আছে খুর। দিশি শয়তানের সুন্দর প্রেমিক প্রেমিক চেহারা। আমি যে জাত-শয়তান, কেউ না জানুক আমি জানি। চোখ মুখ দেখলে মনে হবে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানি না। দেশি, বিদেশি বই পড়ে বড় বড় জ্ঞানের কথা অনর্গল বলে যেতে পারি। পয়লা নম্বরের লম্পট, ভাব দেখাই সর্বত্যাগী ব্রহ্মচারীর। কিছুকাল একটা ক্লাবে ব্যায়ামট্যায়াম করেছিলুম : ফলে বুক বেশ চওড়া, কোমর সরু। হাতের পেশীটেশী বেশ সুগঠিত। আর শয়তানের যেমন হয়, মুখে বেশ একটা বাল-গোপাল, বাল-গোপাল ভাব। যেন এই মাত্র মা যশোদার কোলে বসে নাড়ু খেয়ে, জিভ চোখাতে চোখাতে নেমে এলুম। যে নীপার মাকে দেখে নেচে ওঠে, কেঁপে যায়, সে যে কত বড় কামুক, আমি জানি। মাঝে মাঝে নিজের ওপর অসম্ভব ঘৃণা হয়। জগৎটাকে আমি কোথায় নামিয়ে এনেছি ? ওরে তুই বেরিয়ে আয়। ঠেলে একটু ওপরে ওঠ। কার উপদেশ কে শুনছে ? ছুঁচো তো আর হাতি নয়। যতই শুঁড় তুলুক। জমি থেকে দেড় ফুট।

প্রথম চোটেই আমার সহযাত্রী মা আর মেয়ে দু'জনকেই আমি নিরাসক্ত মুখে দেখে নিয়েছি। যথা সম্ভব ভাল করে। মেয়েটির নাম তনু। নীপার সঙ্গে তুলনা করাও হয়ে গেছে। নীপা হল বর্ষা শেষের সজীব, সবুজ ঘাসের কলি। সমস্ত প্রাণশক্তি নিয়ে মাটি ফুঁড়ে তীক্ষ্ণ শীষের মতো বেরিয়ে এসেছে। তনু হল ফোটা ফুল। এমন মেয়েকে ধীরে বলতে হবে, তোলো, মুখ তোলো। তবেই সে মুখ তুলবে। বলতে হবে, মেলো আঁখি মেলো। তবেই সে চোখ মেলবে। সে চোখ বড় স্নিগ্ধ। সরোবরের মত গভীর। তনু সেবিকা, গণিকা নয়।

এই রকম একটা তুলনা আসায় নিজেই স্তম্ভিত। তবে কি নীপা আমার চোখে গণিকা ?

এই রকম একটা বিশ্রী ভাবনা যখন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, তখন তনু খুব মিষ্টি গলায় বললে, এই নিন। বিশাল একটা ফ্লাস্ক থেকে তনুর মা চা ঢেলে ঢেলে দিচ্ছেন, আর তনু হাতে হাতে এগিয়ে দিচ্ছে। তার হাত থেকে গেলাস

নিতে নিতে চোখাচোখি হল। হালকা একটা হাসি খেলে গেল তার পাতলা ঠোঁটে। মেয়েটি সুন্দরী। মেয়েটি নম্র। তনুর বাবা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর নিলেন। আমার কে কোথায় আছেন। আমরা কুলীন কি না? আগে দেশ কোথায় ছিল। মেয়ের বাবার যা যা জিজ্ঞেস করা উচিত সবই করলেন। তনুর মা হাসি হাসি মুখে সবই শুনলেন। প্রৌঢ়া মহিলা মালা জপছিলেন। তিনি জপ থামিয়ে বললেন, ছেলেটি খুব সুন্দর। ভারি মিষ্টি স্বভাব। আমাদের তনুর সঙ্গে ভাল মানাবে।

তনু আলতো করে দিদাকে একটা চড় মারল।

আমি ইউ পি এস সিতে ডেপুটি ডিরেক্টারের পদে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি শুনে ভদ্রলোক অভিভূত হলেন। বললেন, বয়সটা যে বড় কম।

বয়েসের চেয়েও আমাকে কমবয়সী দেখায়, সেও জানি শয়তানের লক্ষণ। শয়তানের বয়স বাড়ে না। মাঠ ময়দান পেরিয়ে ট্রেন হুহু ছুটছে। তনুর মা, তনুর বাবা, দিদা, আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে লাগলেন, যেন আমি জামাই হয়ে গেছি। নানা ভাবে, নানা ছলে, মেয়েকে আমার দিকে ঠেলে ঠেলে দিতে চাইলেন। সে বেচারির মহা অস্বস্তি। গুরুজনের সামনে কোনও মেয়ে পারে কি সামান্য আলাপে অচেনা একটি ছেলের ঘনিষ্ঠ হতে! নীপা পারে। নীপার জাত আলাদা। নীপা এত মিষ্টি গলায় কথা বলতে পারবে না। নিজেকে এত ঢেকেঢুকে রাখতে পারবে না। নীপা দামাল স্বভাবের। ভীষণ সাহসী সংস্কার মুক্ত।

তনুর বাবা দিল্লিতে কাজ করেন। উদ্যোগ ভবনে। অফিসার। কার একজনের নাম করে বললেন, তোমার চাকরির জন্যে বলে দেব। তারপর বললেন, থাকবে কোথায়?

দিল্লির জনকপুরীতে, তনুদের বাড়িতেই গিয়ে উঠলুম। অনুরোধ ঠেলা গেল না। তাছাড়া দিল্লির আমি কিছুই জানি না। একটু ভয় ভয় করছিল। কোথায় যাব, কি ভাবে যাব। ভদ্রলোকের সাহায্যও একটা বড় কথা। বেশ ছিমছাম, সাজানো, গোছানো, সাহেবী ধরনের বাড়ি। ছোট বাগান। যে কোনও মানুষেরই পছন্দসই শ্বশুরবাড়ি। নীপাদের মতো এলোমেলো হট্টশালা নয়। অতিথিদের থাকার জন্যে আলাদা ঘর, আলাদা ব্যবস্থা।

তনুর বাবার সামান্য পান দোষ ছিল। সন্ধের পরেই একটু এলোমেলো হয়ে গেলেন। বাইরের ঘরে তনুর সামনেই প্রশ্ন করলেন, প্রেম করেছ কোনও দিন?

আজ্ঞে না। মিথ্যেই বললুম। বলার সাহস হল না, প্রেমের প্রথম পাঠ, ফার্স্টবুক টপকে একেবারে লাস্টবুক পড়ে বসে আছি।

মুখে আলু ভাজা পুরে, সামনের দাঁতে কুড়ুরমুড়ুর করতে করতে ভদ্রলোক বললেন, আমি করেছি। ও ইট ইজ হেভেনলি। ইয়াংম্যান তুমি প্রেম করোনি, তোমাদের কালে তো ওই একটা জিনিস, ভেরি চিপ, ভেরি ভেরি চিপ, ইজিলি এভেলেবেল। মাছ পঞ্চাশ, হোয়্যার অ্যাজ প্রেম পাঁচ। দুটো সিনেমার টিকিট, আড়াইঘণ্টার নিশ্চিন্ত সেসান। বিশ টাকায় মোবাইল বেড রুম, কলকাতার ট্যাকসি। আর মেরি স্টোপস ট্রাবল ফ্রি সার্ভিস। পনের মিনিটে সাক্সান পদ্ধতিতে মানুষের উত্তর পুরুষ ভ্রূণাকারে গর্ভচ্যুত। প্রেম করোনি জেণ্টলম্যান! বাঁচবে কি নিয়ে। জীবন যে হাইড্রলিক প্রেসের মতো চেপে ধরবে। স্টেট সেণ্টারের বিবাদে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এই ট্রাবলসাম ওয়ার্লডে প্রেম ছাড়া বাঁচা যায়। আমার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবে?

ভদ্রলোক যখন মেরি স্টোপস বলছেন, তখনই তনু উঠে চলে গেছে।

তনুর মা এলেন। মোটা ডুরে শাড়ি পরেছেন। ভদ্রমহিলা উচ্চতায় সামান্য খাটো হলেও, স্বাস্থ্য ভালো। প্রবীণেরা এমন চেহারাকে বলেন, গায়ে-গতরে। একালের আমরা বলব, সেক্সি।

ভদ্রমহিলা, স্বামীকে বললেন, কি হচ্ছে কি? অল্প খেলেই যখন বাজে বকতে শুরু করো, তখন খাও কেন?

ভদ্রলোক বললেন, কে আমার জ্ঞানদা, সারদা এলেন রে। আমার খাবার কোথায়? হোয়্যার ইজ মাই ফুড?

তনুর মা ইশারায় আমাকে উঠে যেতে বললেন। রাত তখন প্রায় নটা। স্বামীর পাশে এমন কায়দায় বসলেন, যেন বাজারের মাছউলী। মাথার ওপর দু'হাত তুলে খোঁপা ঠিক করলেন। বসে বসেই শাড়ির আঁচলটা পাক মেরে কোমরে গুঁজে নিলেন ভাল করে। মনে হল, এখুনি যুদ্ধ শুরু হবে। এ সবই তার প্রস্তুতি।

হলও তাই। রাত এগারোটার সময় মনে হল, বাড়ি ছেড়ে পালাই। লজ্জা আমার আশ্রয়দাতাদের নয়। লজ্জা আমার নিজের। এই যদি কোনও বড় মানুষের পারিবারিক জীবন হয়, আমার বড় মানুষ হয়ে দরকার নেই। মধ্যরাতে প্রায় উলঙ্গ নৃত্য। সঙ্গের নারীটি প্রায় নরখাদিকা। মারধোর। জিনিসপত্র ছোঁড়াছুঁড়ি। অশ্লীল গালিগালাজ। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। ঘটনা দেখে সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রবণতা সহজাত। সেই রাতেই ভদ্রলোকের সংজ্ঞা পেয়ে গেলাম। ঢাকা নর্দমার নাম ভদ্রলোক। ভদ্রলোক হল ম্যানহোল। লোহার ঢাকনাটা সরে গেলেই দুর্গন্ধময় অসহ্য। সারা জীবনের বেঁচে থাকায় সংগ্রহ হল পাঁক।

মাতালের ডায়লগ থেকে যা প্রকাশিত হল সে রাতে, সবই অভিযোগ,

হতাশা। জীবিকা পছন্দ হয়নি। জীবনের সব আশা ভেস্তে গেছে। কে এক ওপরঅলা, তার নাম মেনন। সে হল শুয়োরের বাচ্চা। স্ত্রী পছন্দ হয়নি ; কারণ তিনি স্ত্রীর ভূমিকা ছেড়ে বাজারের বেশ্যার ভূমিকায় যেতে নারাজ। ফলে ভদ্রলোকের ভাগ্য আটকে গেছে, গোবরে সেঁটে যাওয়া জোনাকির মতো। কে এক ভক্তোয়ার সিং হাই লেভেলে তার স্ত্রীটিকে ছেড়ে তিন বছরেই টপে উঠে বসে আছে। বড় মানুষের বেডরুম ফার্স। বৈচির পড়তি জমিদার বংশের শিক্ষিত সন্তান, এই তাঁর জীবনের মধ্যভাগ। জীবনের শেষটা কি ! সহজ গণিত।

স্বামী স্ত্রী যখন, এই নিয়ে ব্যস্ত ; তখন একমাত্র মেয়ে তনু পেছনের দরজার পইঠেতে একা বসে। আর তার দিদা কোণের ঘরে গভীর নিদ্রায়। জপের মালা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেবে কি-না, সন্দেহ, তবে বিষম পরিবেশে সহজ থাকার উদাসীনতা অবশ্যই এনে দেয়। তা না হলে, বৃদ্ধা এমন প্রশান্ত নিদ্রা পেলেন কোথায়। আবার আমার সেই সংজ্ঞাসিদ্ধি মানে বেহুঁশ হয়ে যাবার হাতধরা কৌশল। সাধনা মানে জড় হয়ে যাবার প্রার্থনা।

বোকার মতো তনুর পাশে কিছু দূরে বসতেই সে ধড়মড় করে উঠে গেল। এর চেয়ে আর বড় অপমান আর কি আছে ? ভাবলে আমি প্রেম করতে এসেছি। আমার ভেতরে একটা কুকুর থাকতে পারে ; কিন্তু আমি তো কুকুর নই। রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইলুম চুপচাপ। দূরে গাড়ির আলো উল্কার মতো ভাসতে ভাসতে চলেছে। আলেয়ার মায়াবী আলোর নাচানাচি। হর্নের আওয়াজ। কেবলই মনে হতে লাগল, কেন এই আতিথ্য গ্রহণ করলাম। এর চেয়ে আমি কালীবাড়িতে থাকলেই ভাল হত।

তনুর বাবার রাতের অধ্যায় শেষ হল এই ভাবে, বিছানায় তাঁকে চিৎ করে ফেলা হল। বুকে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরলেন তাঁর স্ত্রী। অশ্লীল দৃশ্য। আবার ধর্মীয়ও বটে, কারণ মা কালীর এই ভঙ্গী আমি দেখেছি। এই ভঙ্গীতে শ্যামার নাম মনে হয় তারা। শিবের বুকে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। পয়সা খরচ করে মানুষের কি খোঁয়াড়। ওই পয়সায় ভদ্রলোক কত কি খেতে পারতেন—কড়া পাক সন্দেশ, ফিশ ফ্রাই, কাটলেট।

মিনিট দশেক তিনি চিৎকার করলেন, বাবা গো আমায় মেরে ফেললে গো। তনুর মা শুধু স্বাস্থ্যবতী নন, সংস্কারমুক্ত। স্বামী নিয়ে সেকেলে আদিখ্যেতা নেই। তখন জানতুম না, পরে জেনেছি মনস্তত্ত্বের বই পড়ে, পীড়ন করে আর পীড়িত হয়ে মানুষ আনন্দ পায়। আবার এও পড়েছি, নেভার আন্ডার এসটিমেট দি পাওয়ার অফ এ ওম্যান। আবার এও পড়েছি, অ্যাণ্ড হোয়াট ফ্লেশ মোর

পাওয়ারফুল ফর স্পিকিং টু ম্যান, দ্যান ওম্যান। যতই পড়েছি আর যতই দেখেছি ততই মনে হয়েছে, মানুষ পোকার আসরে খেলতে নেমে, কি কালই হল আমার। কালঘাম ছুটে গেল। নির্মলেন্দু চৌধুরীর সেই গানটা কেবল মনে পড়ে, আগে জানলে, আগে জানলে, তোর ভাঙা নৌকোয় চড়তাম না/ নিঠুর দরদী, আমারে ভাল কলে ফ্যালসে। যা তেল ছিল নিঙড়ে বের করে নিলে। কিছু কিছু নিঙড়ে নিলে, আর কিছু আমি এর ওর পায়ে মেরে শেষ করে দিলুম।

তনুর মা কিছুটা দূরে আমার পাশে এসে বসলেন। তাঁর বসার ধরন দেখে মনে হয়েছিল, জমাদারনী নর্দমা সাফ করে এসে পা ছড়িয়ে বসেছে। এখুনি শাড়ির আঁচলের গাঁট খুলে, খইনি বের করে ঠোঁটে ফেলবে। একটু আগে যা ঘটে গেল সবই যেন তাঁর নিত্যকর্ম। ট্রেনে আসার সময় তাঁদের পরিবারের যে সুখী সুখী চেহারা দেখেছিলুম, হয় সেটা মিথ্যে, না হয় এইটাই তাদের সুখ। অথবা বাঁচতে বাঁচতে মানুষের এমন একটা অবস্থা হয় যখন সুখ দুঃখের বোধ আর থাকে না। তনুর মা খুব স্বাভাবিক ভাবেই কথাবার্তা শুরু করলেন। বাড়িতে কে কে আছেন। বাড়িটা কেমন। সঙ্গে বাগান আছে কি না। আমার বোন আছে কি না। গাদা গাদা মেয়েলি প্রশ্ন। সব অবস্থার সঙ্গে মেয়েরা কেমন সহজে মানিয়ে নিতে পারে। প্রকৃত ধার্মিক না হলে এত সহজে জীবনকে মেনে নেওয়া যায় না।

পরের দিন সকালে তনুর বাবা আবার স্বাভাবিক। রেসপেক্টেবল গভর্নমেণ্ট অফিসার। ভদ্রলোক মেয়েটিকে ভীষণ ভালবাসেন। মেয়েও বাবাকে ভীষণ ভালবাসে। ভোরবেলা দেখি, মেয়ের কাঁধে হাত রেখে দিল্লির সায়েব সামনের বাগানে পায়চারি করছেন। আমি তো শয়তান। ঘিন ঘিনে শয়তান। কাল রাতে ভদ্রলোকের উন্মত্ত অবস্থা দেখেছি। আমার মনে হল, দৃশ্যটা খুব নির্দোষ নয়। মেয়ে বড় হলে বাপেরও মতিভ্রম হতে পারে। এই ঘনিষ্ঠতার মধ্যে অসুস্থতা নেই তো! আমার আবার এও মনে হল তনুর ভেতর একটা 'ফাদার-ফিকসেসান' আছে। ও ওর বাবার মতো কাউকে না পেলে বিয়ে করে কোনওদিনই সুখী হতে পারবে না। কাল রাতে তনুর কাছে আমি ভীষণ ছোট হয়ে গেছি। পাশে বসার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে চলে গেছে। আমার হাতে তেমন সময় থাকলে ওর অহঙ্কার আর উন্নাসিকতা ভেঙে দিতুম। সেতারে টোকা পড়লেই ঝঙ্কার উঠবে। কায়দাটা হল বাজানর।

তনুর বাবা ফোন করে সেই বড়কর্তাকে আমার কথা বললেন। হালকা দু চারটে রসিকতাও হল। ফোন নামিয়ে রেখে বললেন, তোমার ভবিষ্যৎ আমি তৈরি করে দেব। মনে মনে হাসলুম, আপনার নিজের ভবিষ্যৎ আগে তৈরি

করুন। জীবনে দু'চারটে ভেন্টিলেটার ফিট করে, একটু আলো বাতাস আসার পথ করুন। কিছুক্ষণ পরে আবিষ্কার করলুম ভদ্রলোক সকালের দিকে ঘণ্টাখানেক পুজোয় বসেন। শক্তির উপাসক। ঠাকুর ঘরে লকলকে শ্যামা মূর্তি। জিভ বের করে হাসছেন। পুজোর পরেই মায়ের পায়ে ফুল দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। ছেলের মাথায় জপের মালা ঠেকিয়ে মায়ের আশীর্বাদ। আমার ধারণা পাল্টাতে শুরু করল। মাতৃভক্ত সন্তান স্নেহপ্রবণ পিতা। প্রেমিক স্বামী। মানুষ যে ঠিক কি, একটা দুটো আচরণ দেখে হদিস পাওয়া কঠিন। শুধু তাই নয় ভদ্রলোক দিলখোলা পরোপকারী।

আমাকে গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে কমিসান অফিসের সামনে নামিয়ে দিলেন। বলে গেলেন, তুমি অপেক্ষা করবে, ঠিক সময়ে এসে তুলে নিয়ে যাব। বললেন, সকালে পুজোয় বসে মাকে খুব ডেকেছি। তোমার হয়ে যাবে। আমার তখন ধর্মে সামান্যতম বিশ্বাস ছিল না। পুরুষকারে বিশ্বাসী ছিলুম। পৃথিবীটা লড়াইয়ের জায়গা। বিনা রণে কৌরবপক্ষ সূচাগ্র মেদিনীও দেবে না। ভাগ্য আবার কি ? অক্ষম, অপদার্থকে ভগবান আকাশের চাঁদ ধরে দেবেন ? অসম্ভব।

যাই হোক ইন্টারভিউ অসম্ভব ভাল হল। বোর্ডে তনুর বাবার সেই বন্ধু ছিলেন। এস· ফোতেদার। ভদ্রলোক অসম্ভব ভাল ব্যবহার করলেন। সাহায্য করলেন। উঠে আসার সময় বললেন, উইশ ইউ গুডলাক। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছি, উঠল ধুলোর ঝড়, যাকে বলে আঁধি। অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। চারপাশ অন্ধকার হয়ে এল। কোয়েসলারের সেই ডার্কনেশ অ্যাট নুন। চারপাশ ঝাপসা। গাড়িগুলোকে তিন কোণা দেখাচ্ছে। পাঞ্জাবী মেয়েদের দোপাট্টা কাঁধের দুপাশে ফনফন করে উড়ছে পরীর ডানার মতো। লোকজন দৌড়চ্ছে চারপাশে। আমার পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে একজন বলছে, ভাগো ভাগো, বুদ্ধু কাঁহাকা। আমি একটা অফিস বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লুম। আমার মতো আরও অনেকে আশ্রয় নিয়েছে। বেশীরভাগই পাঞ্জাবী ছেলেমেয়ে। বাঙলার মেয়েরা তখনও অত স্মার্ট হতে পারেনি। কেউ কেউ হয়েছে, যেমন নীপা। তনু সেই তুলনায় এখনও সেকেলে। পাঞ্জাবী মেয়েদের দিকে সহজে তাকানো যায় না। মন খারাপ হয়। সবাই যেন কিন্নর কন্যা। কিছু দিন আগে আমার এক অধ্যাপক পাঞ্জাবী এক শিল্পীকে বিয়ে করেছেন। এখনও সেই ঈর্ষা আমার গেল না। ইংরেজিতে বলে, ক্রুকেড মাইণ্ড। আমি সেই মনের অধিকারী। জিলিপির মতো পাকানো আর প্যাঁচানো মন। আমার চেয়ে কারুর ভাল হলে জ্বলে পুড়ে যাই। বেশ ধান্দবাজ। স্বার্থপর। প্রয়োজনে পা চাটব। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই মারবো লাথি। যে শয়তান হবে, তার চেহারাটিও ভাল হবে। দর্শনধারী।

আমার এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। খাড়া একটা গ্রীসিয়ান নাক। দার্শনিকের মতো দুটো চোখ। বহুদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাপ করার চেষ্টা করেছি, ভেতরে শয়তানির পরিমাণ কতটা। পারিনি। এত ভালোমানুষের মতো মুখ। গেরুয়া পরিয়ে দিলে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। আমার পাশে একা একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিছুটা দূরেই লিফ্‌ট। বাইরে আঁধি চলেছে। ওই ধুলোর পর্দার মধ্যে যারা ঘোরাফেরা করছে, তাদের কেমন যেন বড় বড় দেখাচ্ছে। ছায়াদৈত্য। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। প্রকৃতির খেলা দেখছি। ভাবছি রাজস্থানের মরুভূমির কথা। উটের কথা, রঙীন ঘাঘরা পরা বেদুইন মেয়েদের কথা। প্রায় কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটি। সুন্দর সেন্ট মেখেছে। গায়ে নীল ওড়না। পৃথিবীকে মানুষ পৃথিবী বলে কেন, বলা উচিত ফাঁদ। ভূমির আয়োজনে কোথাও ত্যাগ বা বৈরাগ্যের প্রেরণা নেই। মুক্তি আছে আকাশে। থাকলে কি হবে, মানুষ তো আর পাখি নয়।

হঠাৎ মনে হল দেখি, মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করা যায় কি না ? ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলুম, এই ঝড় শেষ হবে কখন ? ভেবেছিলুম উত্তর পাব না। অহঙ্কারে মুখ ঘুরিয়ে নেবে। তা নয়, সামান্য পুরুষালি গলায় বললে, আধ ঘণ্টাও হতে পারে। এক ঘণ্টাও হতে পারে।

ওই পুরুষালী গলার মোহে পড়ে গেলুম। যাকে বলে, 'সাইক', মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আঁধার, সেই আঁধার হাতড়ে নিজেকে তখনও আবিষ্কার করা হয়নি। তখনই যদি মনের ওই নিমজ্জিত অংশের খোঁজ পেতাম, তাহলে বুঝতে পারতাম, কেন ভাল লেগেছিল মেয়ের গলায় পুরুষ-কণ্ঠ ?

কথা চালাবার জন্যেই, হঠাৎ আমার জানার ইচ্ছে হল, আঁধি কেন হয়। প্রায় ছেলেমানুষের কৌতূহল।

মেয়েটি হাসল। হেসে এত সহজ হয়ে গেল, বুঝলুম আমার এই কায়দা যে কোনও মনের দরজা, নিমেষে খুলে দিতে পারে। এই হল আমার 'মাস্টার কি'। সেই চাবি আজও আমার হাতে। হারিয়ে ফেলিনি।

বললে, আমি আর্টসের ছাত্রী ছিলাম। বিজ্ঞানের কিছুই জানি না ; তবে আমার বাবা আবহাওয়া অফিসের একজন বড় বিজ্ঞানী, তিনি অবশ্যই জানবেন। তুমি কি সত্যিই জানতে চাও ?

অবশ্যই চাই। মেয়েটি খুশি হল। তার বাবার নাম, তাদের ঠিকানা লিখে একটা কাগজ আমার হাতে দিল। মেয়েটির নাম অমৃতা। ঠিকানা দেখে মনে হল তনুদের এলাকাতেই। এ কথায়, সে কথায় বেশ আলাপ হয়ে গেল। মেয়েটা বেশ দিলখোলা। স্পোর্টসওম্যান। বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়ান। সেন্ট্রাল

সেক্রেটারিয়েটে চাকরি করে। যখন চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল আমার পাশে, তখন মনেই হয়নি এত কথা বলতে পারে। মেয়েটা বকতে ভালবাসে। কথা শুরু করার আগে একটা মুদ্রাদোষ আছে—আরে ইয়ার না বলে শুরু করতে পারে না।

আমরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছি, সেখানে আরো অনেক লোক এসে জুটেছে। বেশ ভিড় হয়ে গেছে। বাজারের মতো হইহল্লা হচ্ছে। হঠাৎ বেশ একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। সকলেরই প্রশ্ন—ক্যা হুয়া। ভাই কেয়া হুয়া।

কে একজন বললে, চীন ভারত আক্রমণ করেছে।

সেই সময়ের কথা ভাবি, আর হেসে মরি। চীন আক্রমণ করেছে শুনে আমার মনে হল, তাহলে এই ধুলোর ঝড় তো আঁধি নয়। চীনে সৈন্যরা ছুটে আসছে রাজস্থান থেকে দিল্লির দিকে, কামান দাগতে দাগতে, এ নিশ্চয় সেই ধুলো। বাঙালীর ছেলে, যুদ্ধের নাম শুনলেই ভয় করে। ভূগোল হারিয়ে ফেলেছি। চীন কোন দিক দিয়ে নামবে সে সব খেয়াল নেই। মনে হল দিল্লি যখন রাজধানী, আক্রান্ত হল বলে। ধুলোর পর্দা ভেদ করে লোক ছুটছে, আমার মনে হচ্ছে চীন তাড়া করছে।

ভয়ে ভয়ে অমৃতাকে প্রশ্ন করলুম, হোয়েন, দে উইল স্টার্ট বম্বিং!

এত জোরে হেসে উঠল, লজ্জা পেয়ে গেলুম। আরে ইয়ার। লেট দেম ফার্স্ট ক্রস দি বর্ডার। বিফোর দ্যাট, উই উইল গিভ দেম এ গুড পাউণ্ডিং।

দেখলুম, আমার মতো যুদ্ধের কথা কেউই ভাবছে না। সব অন্য কথায় ব্যস্ত। বৈজয়ন্তী মালা, দিলীপকুমার, মীনাকুমারী, ওহিদা সেই সময় ওঁরাই ছিলেন একচ্ছত্র। একটু পরেই রাত হবে, তখন তো ওই জগতেই ঢুকতে হবে। কে আবার বললে, নাইট শো বন্ধ। রাতে ব্ল্যাক আউট হবে।

সব শুনে এত অসহায় লাগছিল! রাত হবে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। দিল্লির কিছুই জানি না। কি করে ফিরব! অমৃতাকে মনে হতে লাগল, আমার মা। ফেলে চলে যেও না মা, পৌঁছে দিও জনকপুরী। বাঙালীর ভীতু মন নিয়ে শিখ তনয়ার সঙ্গে অন্য সম্পর্ক অসম্ভব। ওই মা ছেলেই ভালো।

আর এখন, জীবনের খাতা বন্ধ করার সময় মনে হচ্ছে, পুরুষ যদি বাঁচতে চাও প্রথম থেকেই মা বলো। সারেণ্ডার, সমর্পণ। শান্তির ওই এক পথ। সাধনা ওই একটাই। নোলায় ছ্যাঁকা, আর মা বলার সাধনা, চেষ্টা।

অমৃতার সঙ্গেই ফিরে এলুম জনকপুরীতে। ওই একই পাড়াতে ওদের বাড়ি। সন্ধে সাতটার সময় ওদের বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ করে গেল। তনুদের চেনে। আমি ফেরার ঘণ্টাখানেক পরে তনুর বাবা ফিরলেন। ভদ্রলোক যে কত

স্নেহপ্রবণ আগে বুঝিনি। প্রথমে রাগে ফেটে পড়লেন। তোমাকে আমি অপেক্ষা করতে বলেছিলুম। বলেছিলুম কি না? সারা দিল্লি তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজেছি। রাস্তার প্রতিটি মানুষকে দেখতে দেখতে আসছি। ইরেসপনসিবল। বলতে বলতে ভদ্রলোকের চোখে জল এসে গেল। আমি তোমার বাবাকে চিঠি লিখব। তনুর মা বলেছিলেন, তোমার আপনপর জ্ঞান নেই। যাকে দেখ তাকেই ভাব নিজের ছেলে।

আমার মতই অবস্থা। কিছুকাল যুবতী মেয়ে দেখলেই মনে হত আমার স্ত্রী। তাকান মাত্রই, কি গো বলে আমার ঘাড়ে এসে পড়বে। আরে ভূমি আর নারী প্রায় এক জিনিস। প্রায় কেন, একেবারে এক। প্রথমে অধিকার। রাইট। ওনারশিপ। দলিল পাটা, পরচা। পিলার দিয়ে সীমানা চিহ্ন। সিঁথির সিঁদুর। তারপর চাষবাস বারো মাস। ভূমি আর নারী উভয়েই ফলদায়িনী। লিজেই নাও আর কিনেই নাও, আগে পিলার পুততে হবে। জমি নিয়েও খুনখারাপি, নারী নিয়েও খুনোখুনি। আছি ভাল।

এখন আমার তনুর কথা মনে পড়ে। তনুর বাবা, তনুর মায়ের কথা মনে পড়ে। তনুর দিদা। মনে পড়ে অমৃতার কথা। আরও অনেকের কথাই মনে পড়ে। শুরুর মানুষদের শেষে ভীষণ স্মরণে আসে কারণ সে হল আমার অতীত। অমৃতার কথা সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে, কারণ অমৃতার সঙ্গে দিল্লি থেকে আমি হরিদ্বার হয়ে দেরাদুন গিয়েছিলাম পরের দিন। বেকারের বিদেশ ভ্রমণ। বিজয়ী বীরের স্বভাব আর কি? এক কেল্লা দখল করেই, আর এক কেল্লার দিকে ছোটে। অনেক সময় কেল্লাই বীরকে হজম করে ফেলে। অমৃতাকে দখল করব কি, সেই আমাকে দখল করে ফেলেছিল। আমি যেন তার হাতের বাস্কেট বল। যেমন ছিলেন তনুর বাবা। তনুর মায়ের ময়দার তাল। বেশি বয়সের বিয়ে। ভীতু, স্ত্রৈণ। স্ত্রী বোধ হয় মারধোরও করতেন। তাইতেই সুখ। সুখী হওয়া নিয়ে কথা। মেরেই হোক আর মার খেয়েই হোক। মধ্য কলকাতার বড় বড় বাড়িতে পাঠ্ঠা পাঠ্ঠা সব চাকর থাকে। মালকিনদের শাড়ী আর অন্তর্বাস কাঁচে। ঝেরে ঝেরে শুকোতে দেয়। তাইতেই মহানন্দ, মহাসুখী। ক্রীতদাসেরও আনন্দ আছে। সাধক বলেন, দাস আমি। দাসোহং। ক্রীতদাসও বলে। কারুর প্রভু আকাশে অদৃশ্য। কারুর প্রভু ভূমিতে দৃশ্য। ভাবটা একই। আর ভাবের জগতে থাকাটাই আনন্দের।

অমৃতার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। কেন হল? কারণটা জানতে পেরেছি এই পঞ্চাশ বছর হাঁটার পর। জীবনের পাহাড়, পর্বত, নদী, প্রান্তর পেরোবার পর। কিছু মেয়ে 'স্লিপার' ধরনের পুরুষ পছন্দ করে। ডাক্তারী পরীক্ষায় পুং আসলে

ক্লিং। সাদা, সাদা, পাতলা, পাতলা দুটো পায়ের তলায় চটির মতো চর্চিত করার যেমন আনন্দ হবারও তেমনি আনন্দ। চটির আনন্দ চটি কি প্রকাশ করতে পারে। ট্রেনে সামনা সামনি আসনে আমরা দুজন জানলার ধারে। হু হু ছুটছে ট্রেন। অমৃতা পা দুটো আমার আসনে তুলে দিয়েছে। মেয়েটা কথায় কথায় ভাল খিস্তিও করতে পারত। 'আরে শালে' আর 'আরে ইয়ার' তার কথার মাত্রা। হাত আর পা দুটোই তার ভাল চলত। নিজের রসিকতায় উল্লসিত হয়ে মাঝে মাঝেই লাথি আর পায়ের খোঁচা। বাস্কেট বলের পা। পাতা, আঙুল সবই লম্বা লম্বা। পায়ের মাঝের আঙুলে রূপোর রিং। মেয়েদের পায়েও সেক্স। এই সেদিন এক বিলিতি ম্যাগাজিনে পড়ছিলুম, মেয়েদের সারা শরীরেই সেক্স জড়ানো। যেখানটা স্পর্শ করবে সেখানটাই বেজে উঠবে। অমৃতার অমৃত লাথির জন্যে বুড়ো এখনও ব্যাকুল। অমন প্রাণখোলা নির্ভেজাল লাথি কেউ তো মারতে পারবে না।

হরিদ্বারে আমি উঠলুম ধর্মশালায়। অমৃতা চলে গেল তার আত্মীয়ের বাড়িতে। সে যখন বিদায় নিয়ে চলে গেল, তখনই বুঝলাম আমার একটা অ্যাটাচমেন্ট এসে গেছে। ভেতরটা ফাঁকা। দুদিন হরিদ্বারে থেকে আমরা দেরাদুন যাব। সেখানে অমৃতাদের 'অরচার্ড' আছে। লিচু, চেরি, আম, আপেল। ঠাকুরদার সম্পত্তি।

ধর্মশালার সন্ন্যাসী-সঙ্গে মনটা পাল্টে গেল। নীপা আমার ফার্স্টবুক। অমৃতা র‍্যাপিড রিডার। আকাশ মেঘলা হলে, ঘরের আলো কমে আসে। মনের ঘরে নরম আলোয় কবিতার লাইন তৈরি হচ্ছিল। সেই অমৃতা হাত নেড়ে তার দেশোয়ালীদের কাছে চলে গেল, বড় অভিমান হল। অভিমানীর ধর্ম শঙ্করাচার্য। বেদান্তের উৎসই হল জগৎ ও জীবনের প্রতি অভিমান। প্রেমের লাথিতে বৈষ্ণব। প্রত্যাখ্যানের লাথিতে বৈদান্তিক। এও মায়া, ওও মায়া। এ মায়া পূর্ণ ও মায়া শূন্য। দুটিই রমণীর রূপ। ধর্ম হল রমণীর শরীর। যে লীলায় আমি গর্ভস্থ এবং জাত, সেই একই গর্ভে ধর্মও জাত। একই সঙ্গে দুই যমজ। ধর্ম আর ধর্ষণ মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। প্রভু আর পিতা। ন্যায় কি বলেন! কি বলেন শ্রুতি, শাস্ত্র, দর্শন? দর্শনের জন্যে দ্রষ্টা চাই। আমি সেই দ্রষ্টা। প্রথমে মোহ। পরে অবধারিত মোহমুদ্গর। অভিমান। শূন্যতা। দর্শন। পাত্র আগে শূন্য হোক, তারপরে ভরো জ্ঞান। জ্ঞান হল আরক, নেশা। ভুলতে হবে। ছুটতে হবে তার পেছনে। যিনি 'তিনি'। 'তিনি' কিনি। যিনি অধরা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লীলা তব। নাহি পারে বুঝিতে। খেপার মতো খুঁজতে হবে, একটা অনুভূতি যাতে আছে হাজার মিথুনের সুখ, শত সুন্দরীর অঙ্কশায়িনী হবার বঞ্চনাহীন সুখ।

করি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধন।
প্রেম সাধিতে ফেঁপে ওঠে কাম-নদীর তুফান ॥
প্রেম-রতন ধন পাওয়ার আশে
ত্রিবেণীর ঘাট বাঁধলাম কষে,
কাম-নদীর এক ধাক্কা এসে
যায় ছাঁদন-বাঁধন ॥
বলব কি সে প্রেমের কথা,
কাম হইল প্রেমের লতা
কাম ছাড়া প্রেম যথাতথা
নাইরে আগমন ॥
পরমগুরু প্রেম-পিরিতি
কাম-গুরু হয় নিজ পতি
কাম ছাড়া প্রেম পাই কি গতি
তাই ভাবে লালন ॥

লালন ভাবেন, আর আমি ভাবি না। বিজনে বসে আমিও তাই ভাবি এখন। জীবন সেতারে গতের জমজমা বাজান হয়ে গেছে। শ্রোতার আসন খালি। করতালির শব্দ ঝাঁক পায়রা হয়ে উড়ে গেছে। এখন শুধু টিংটাং। ত্রিবেণীর ঘাট আমিও তো কষে বাঁধতে চেয়েছি। পারিনি। পারলেই বা কি হত! এই তো হরিদ্বার। প্রবাহিত গঙ্গা হর হর। প্রদীপ ভেসে চলছে, সীমন্তিনীর টিপের মতো। ভজন চলেছে ওপাশে। ভজ মন কৃষ্ণ, রাম নাম জপ, জানকী সীতারাম। এ পাশে নিরঞ্জনী আখরায় সাধু বসেছেন ধ্যানে। ওপাশে শিবালিক। অলকানন্দা নেচে চলেছে পাথরের মঞ্চে। তবু অতৃপ্তি। সব মুখেই দুলছে না পাওয়ার ছায়া। মানুষ আসে একটা ধারণা নিতে। আর কিছু না। হাওয়া ধরো, আগুন স্থির করো, যাতে মরিয়ে বাঁচিতে পারো, মরণের আগে মরো, দেখে শমন যাবে ফিরে ॥

একা একা সারা হরিদ্বার ঘুরতে ঘুরতে মনে ধরে গেল বৈরাগ্যের রঙ। ওদিকে লছমনঝুলা, ঋষিকেশ, এপাশে গঙ্গা পেরলেই চণ্ডী পাহাড়। মাঝে মাঝে নীরব গম্ভীর সাধুদের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া। কারুর কারুর এমন রূপ, এমন স্বাস্থ্য, নিজেরই আপসোস হত এমন যার রূপ তিনি তো সহস্র রূপসীর মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারেন। কার আকর্ষণে সব ছাড়লেন? প্রশ্ন অনেক। উত্তর একটাই।

যোনিতে লিঙ্গেতে শৃঙ্গার করে ভাই সবে।

করুক যথেষ্ট কেনে তাহে কিবা হবে ॥
পশুপক্ষী জীবাদিতে করয়ে শৃঙ্গার।
প্রাপ্তি কি হইবে হেন করিলে তাহার ॥
আত্মায় আত্মায় যেবা করয়ে রমণ।
রসিকের শিরোমণি জানি হেন জন ॥

আত্মায় আত্মায়। একদিন বিকেলে চণ্ডীপাহাড়ের কাছে এক সাধককে সাহস করে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি হেসে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, অনেক দেরি আছে, সময় হয়নি। তারপর আর একটি অদ্ভুত কথা বলেছিলেন, যখন দেখবে তোমার ঘামের দুর্গন্ধ কমে গেছে, তখন জানবে সময় হয়েছে। যদি না হয়, জানবে হল না। আবার ঘুরে এস। আবার জন্মাও। ফিরে ফিরে এস। ক্ষয় করো। কর্মক্ষয়, পাপক্ষয়।

আর দাঁড়ালেন না। হনহন করে চলে গেলেন পাহাড়ী পথ ধরে। মনে হল ডাকের চিঠি। পোস্টাপিসের স্ট্যাম্প খেতে খেতে ঘুরে বেড়ায়। হরিদ্বারের স্ট্যাম্পটা এখনও বেশ স্পষ্ট। মনে হয় আবার যেতে হবে। শুনেছি প্রাচীন চীনে মানুষ বৃদ্ধ হলে সব ছেড়ে চলে যেত পাহাড়ে। অপেক্ষা করত মৃত্যুর জন্য। হঠাৎ একদিন উড়ে আসত সাদা একটা পাখি

হরিদ্বারে আমার জায়গা ঠিক আছে। প্রথম জীবনের কর্মকাণ্ড ভেসেই যায়। এক জীবনের দুবার জীবন শুরু করতে হয় ? জীবন হল অভ্রের পাত। ছাড়াতে হয়। একটার তলায় আর একটা। সাদা পাখি আসবে কবে কেউ জানে না। কবে ঠোঁটে করে খুলে দেবে খাঁচার দ্বার ! পাখি জানে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

আমি যখন হরিদ্বারে অমৃতার অমৃত-লোভে ভেসে বেড়াচ্ছি, তখন আমার মা মৃত্যুশয্যায়। হঠাৎ অসুস্থ। আমাদের পরিবারে প্রায় সকলেরই মৃত্যুর সঙ্গে একটা চুক্তি আছে। সকলেই গেছেন হঠাৎ। সেই আশা আমারও। এই সেদিনই একটা গল্পে পড়লাম, ভারি সুন্দর মৃত্যু :

Heathcote M.C. did not die a soldiers death ; he simply fell asleep one night by the fire.side,the yorkshire post on his lap.

মৃত্যুর কাছে আমার ওই ধরনের আব্দার আছে। তবে মৃত্যুর মত নিষ্ঠুর আর কে আছে ! নেবে, তবু দুই দুই। আর আমি যখন, অমৃতার তল্পিবাহক হয়ে দেরাদুনে, তখন আমার মা মারা যাচ্ছেন। মানুষের যখন দুঃখ আসে, যখন চোখ ফেটে জল বেরোয়, যখন বুকের ভেতরটা মোচড়াতে থাকে, অনুশোচনায় যখন

পুড়তে থাকে তখন ঘটনা ঘটে গেছে। সব অতীতে চলে গেছে। ফিরে গিয়ে আর কিছু করার থাকে না।

মায়ের মৃত্যুর সময় মিলিয়ে আমি পরে দেখেছি, তিনি যখন শেষ নিঃশ্বাসটি মোচন করছেন, তখন আমি দেরাদুনে সহস্রধারার সামনে দাঁড়িয়ে। ওদেশে বলে সনসন ধারা। চারপাশে পাহাড় মাঝখানে গরম জলের লেক। জলে গন্ধকের গন্ধ। কাচের মতো স্বচ্ছ। স্নান করলে সারা শরীর চনমন করে ওঠে। জলে নামতে হয় নিরাভরণ হয়ে। লজ্জাশরম থাকলে সনসন ধারায় স্নান হবে না। প্রথমে অমৃতার ওড়না এল আমার হাতে। আমি তার দেহাভরণের জিম্মাদার। তারপর হাতে এল তার কামিজ। শুধুমাত্র বক্ষবন্ধনী পরা পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চির সুঠাম একটি শরীর আমার সামনে। আমার মা তখন মারা যাচ্ছেন। বক্ষবন্ধনী এল আমার হাতে। এক পলকের দেখা। চোখ নেমে গেল মাটিতে। আমার সংস্কার। মা তখন আমার নাম ধরে শেষ ডাকা ডাকছেন। অমৃতার শালোয়ার খুলে গেল। ভেনাস নেমে গেল স্বচ্ছ, উষ্ণ, গন্ধক-গন্ধী জলে। শরীরের কোথাও এক ইঞ্চি মেদ নেই। আমি তখন অমৃতার কাণ্ডকারখানা দেখছি। দেখছি স্বচ্ছ জলে আরও আরও নগ্ন স্নানার্থীর খেলা, তখন আমার মাকে শেষ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত করা হচ্ছে। লালপাড় সিল্কের শাড়ি। সিঁথিতে পুরু সিন্দুর। গলায় গোড়ের মালা। খাটের চারপাশে গোছা গোছা ধূপ। মায়ের আলতা পরা পা দুটো যখন আমার বুকে থাকা উচিত ছিল, সেই সময়ে আমার বুকে ধরা একটি ওড়না, কামিজ, ঘামে ভেজা বক্ষবন্ধনী, শালোয়ার। ধূপের গন্ধ, ফুলের গন্ধ নয়, দেহের গন্ধ।

অমৃতা সেই সময় বলেছিল, আরে ইয়ার নেমে এসো।

ইডেনের সরোবর। আদম আর ইভের স্নানদৃশ্য। আমার লজ্জা করছিল সব খুলতে। মেয়েরাই লজ্জা ভাঙায়। তারাই পাপ তারাই পুণ্য। আমার মাকে যখন সবাই কাঁধে তুলে, প্রথম হরিধ্বনিটি দিয়েছে, তখন আমি জলে। অমৃতা আর আমি দুটো মাছের মতো জলে খেলছি। অমৃতা বলছে, তোমার চেহারাও তো স্পোর্টসম্যানের মতো। খেল না কি ? আজ দেখবো তুমি কেমন খেলতে পার ? মেয়েরা যখন এমন কথা বলে, তখন অনেক রকম মানে করতে ইচ্ছে করে। অমৃতা যখন বলছে, দু হাত দিয়ে আমার পিঠটা ঘষে দাও, তখন আমার মা শ্মশানের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। শুনেছি প্রিয়জন যাবার আগে দূরের মানুষকেও নাড়া দিয়ে যান। আমার তেমন কিছু মনে হয়নি। চারপাশের পাহাড়ের দেয়াল বেয়ে কুলকুল করে স্বাস্থ্যকর, ক্লান্তি অপহরণকারী জল নামছে সহস্রধারার সরোবরে। আমি তখন বেঁচে আছি আর একভাবে, অন্য চিন্তায়।

ইংরেজ কবি চসারের মতো ভাবছি

What is better than wisdom?

And what is better than a good woman? Nothing.

পৃথিবীতে আর কিছু নেই। সত্যিই নেই। এই বার্ধক্যে শরীর যখন হলহল করছে, সব যখন ঝলঝলি, খলখলি, তখনও মাঝে মাঝে নীপার কোনও কোনও দেহভঙ্গীর দিকে তাকালে ভিজে কাঠেও আগুন ধরে যায়। ওদিকে বইয়ের র‍্যাকে উপনিষদ। জ্ঞানেশ্বরী। কোলের ওপর গীতা। নীপা ভিজে কাপড়ে সামনে দিয়ে চলে গেল। শরীর আগের চেয়ে একটু ভারি হয়েছে। আমি দু ছেলের বাপ। হার্টে একবার দমকা লাথি খেয়েছি। ঘাড়ের কাছে কথামৃত, চোখের সামনে ঈশাবাস্যমিদং সর্বং, তবু মনে পড়ে, সেই চিলেকোঠা, ছবির মাথায় দুলছে ছুঁড়ে দেওয়া বক্ষবন্ধনী, ধারে তার লেসের ফ্রিল, নীপা কাঁপছে, যেন ম্যালেরিয়া ধরেছে। ইন্দ্রিয়ের কাছে গীতা দুর্বল, কথামৃত হীনবল, বেদবেদান্ত দূরের মেঘ। সব মিটে যাবার পর, সামান্য প্রলেপ। হলে হয়, কিন্তু কেন হব। যে পৃথিবীতে নীপা আছে, অমৃতা আছে, নীপার মা আছে, তনুর মা আছে, সেই পৃথিবীতে আমার মরা ছাড়া আর কোনও মুক্তি আছে?

When Adam delved and Evespan

Who was then a gentleman.

অমৃতার ঠাকুরদার বাগানটা নেহাত ছোট ছিল না। এদের কত পয়সা তাই ভাবি। তাছাড়া উদ্যোগ। বাঙালীর মতো বসে, আড্ডা মেরে পরচর্চা করে দিন কাটায় না। নিজেদের মানুষ ভাবার কত সুবিধে! আমি খাই দাই, রোজগার করি, বিয়ে করি। রাতে বুক ফুলিয়ে বউয়ের সঙ্গে শুই। শুয়ে ধর্মচর্চা, সাহিত্যচর্চা, সংস্কৃতিচর্চা করি না। প্রাণখুলে সম্ভোগ করি। বংশবৃদ্ধির ভয়ে আঁতকে মরি না। ফ্যামিলি বাড়ুক পরোয়া করি না। রোজগারও বাড়বে। বাঙালীর সবই ডিসপেপটিক। বাইরে সব দেবতা। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য কিছুই নেই। সব জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ। সবেতেই ছিছি ভাব। অথচ! এই অথচতেই ঘোড়া মরেছে। দেরাদুনে এসে বাঙালী এই রকম একটা ফলাও বাগান করুক তো। এত সুন্দর বাঙলো! দরজা, জানালার ছ্যাঁদা ন্যাকড়া দিয়ে বন্ধ করে বাঙালী বউকে চুমু খাবে। যেটা অপরাধ নয়, জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা, সেইটাকেই মহা অপরাধ ভেবে বাঙালীর যত লুকোচুরি। সেই জন্যেই বলে, ঘোমটার আড়ালে খ্যামটা নাচ। মতি শীল স্ট্রিটে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জিনিস কিনতে যাচ্ছে যেন চুরি করতে যাচ্ছে।

অমৃতার দাদা আর বউদি ওই অরচার্ড দেখতেন। দাদার বোধহয় শিক্ষাদীক্ষা

তেমন ছিল না, কিন্তু বড় মজার মানুষ। দিলখোলা, প্রাণবন্ত পুরুষ। স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী। সারাটা দিন শুধুই খেটে চলেছেন। কোনও অভিযোগ নেই। বাঙালী মেয়ে হলে সংসার রসাতলে যেত। মুহূর্তে মুহূর্তে কুরুক্ষেত্র হত। ভদ্রলোক মাটি চিনতেন, গাছ চিনতেন, মানুষ চিনতেন, আর চিনতেন নারী। আমি তিনদিন ছিলাম, তিন দিনে বুঝেছিলাম জীবন্ত জীবন কাকে বলে। আমি ঈশ্বর নই এইটা ভুলতে পারলেই মানুষ সুখী হতে পারে। মানুষ ভয়েই মোলো। কিসের ভয়! যাঃ এই বুঝি পাপ করে ফেললুম! এই বুঝি আমার ঈশ্বরত্ব খারিজ হয়ে গেল।

অমৃতার দাদার বোধ হয় সদ্য বিয়ে হয়েছিল। ফল যা হয়। আমার একটু অস্বস্তিই হত। ভদ্রলোক গ্রাহ্য করতেন না। মানুষের ঘোড়া হল একটি রিপু। সেই রিপুটি হল কাম। হিসেবের খাতা যখন খুলে বসেছি, তখন পাই পয়সার হিসেবও লিখতে হবে। আমার ছেলেটা তখন তিন বছরের। ব্যাসেলাই ডিসেন্ট্রি। যমেমানুষে টানাটানি চলেছে। আমি আর নীপা পরপর তিন রাত জেগে। প্রথম রাতটা ও জাগত, শেষ রাতটা আমি। দুজনেরই ভীষণ মন খারাপ। ছেলেটা বাঁচলে হয়। প্রথম সন্তান। ভেবে ভেবে, জেগে জেগে শরীর কাহিল। সকালে বাজার করতে বেরলে মাথা ঘোরে। পা টলবল করে। সেদিন শেষ রাত। মরা চাঁদের আলো বিছানায় এসে পড়েছে। মাঝে ছেলে। ওপাশে নীপা, এপাশে আমি। নীপা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা হাত কপালে। আর একটা হাত ওপাশে ছড়ানো। গভীর নিঃশ্বাসে ভারি বুক ওঠানামা করছে। পায়ের দিক থেকে শাড়িটা অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে। হাঁটু, পা, কোমর, পেট, বুক, মুখ, চুল চাঁদের আলোয় ভাসছে। মাঝে আমার ছেলে। রোগে ভুগে পাণ্ডুর। আমি দুজনের দিকেই তাকিয়ে আছি। শরীরের এমন অবস্থা বালিশে মাথা ঠেকালেই মরে যাব। হঠাৎ সারা শরীরে ঢেউ খেলে গেল। আগুন জ্বলে উঠল। সন্তান, স্নেহ, মৃত্যুচিন্তা, সব ভেসে গেল। আমি যেন দুটো চোখ। দুটো হাত যেন দুটো থাবা। আমার কোমর থেকে শরীরের নিম্নাঙ্গ যেন লাঙ্গুল আস্ফালনকারী ব্যাঘ্র। ঘুমন্ত নীপা কনুইয়ের ঠেলা মেরে আমাকে সরিয়ে দিতে চাইল। বলেছিল, তুমি কি মানুষ? অবশ্যই মানুষ। আমার দুটো হাত, দুটো পা, একটা মাথা। আমি মানুষ নই! অবশ্যই আমি মানুষ। ছেলেটা কাঁদছে কাঁদুক। আর কি আশ্চর্য, ওই মুহূর্তে, ডক্টরেট আমি, বিশাল চাকুরে আমি, সম্মানিত আমি, আমি ভেবেছিলাম, ওই সন্তান আমার নয়, নীপা আমার সন্তানের জননী নয়, নীপা আমার দেহ, ফ্লেশপট। ওম্যান ইজ এ উম্ব। সেই অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে নীপা বাঁ হাত দিয়ে অসুস্থ সন্তানকে চাপড়াতে লাগল। ভোলাবার চেষ্টা করতে লাগল। চাঁদের আলোয় দেখতে পাচ্ছি নীপার সারা মুখে বিরক্তি, ঘৃণা। আনন্দ

নয়, সহ্য। সহযোগিতা নয়, সমর্পণ।

আর সেই আবেগেই জন্মেছিল আমার মেয়ে। সেই মেয়ে যদি এখন আমার মুখের ওপর স্পষ্ট বলে, যা করছি, বেশ করছি। তোমরা কি করেছিলে মনে নেই, তখন তো আর কিছু বলার থাকে না। চোরের মায়ের বড় গলা কি সাজে! আমি যে আমার ভবিষ্যৎ তৈরি করতে করতে আসছি। নদী যেমন আসে পলি ফেলতে ফেলতে। এখন আর নিজেকে চাবকালে কি হবে? ফিরে গিয়ে তো আর শুরু করা যাবে না। জীবন হল টুথপেস্ট। বেরিয়ে গেলে আর ঢোকানো যায় না। পড়েই শান্তি :

Mankind is ruled by the Fates, they even govern those private parts that our clothes conceal. The slave who ploughs his master's field has less trouble. Than the one who ploughs him. এখন আমি বুঝেছি ভাল বীজ থেকে যেমন ভাল গাছ হয়, তেমনি শুদ্ধ, সাত্ত্বিক বীজ থেকেই সুসন্তান হয়। ইহুদীদের ধর্মশাস্ত্র তালমুদে আছে, তুমি তোমার স্ত্রীতে উপগত হলে, আর তোমার স্ত্রী সেই সময় পরপুরুষের কথা ভাবছে, তখন তোমার স্ত্রীর চেয়ে ব্যভিচারী আর কেউ হতে পারে না। সেইটাই সবচেয়ে বড় অ্যাডালটারি। তাহলে বিপরীতটাও সত্য। আমি নীপাতে, আর আমার মন অমৃতাতে, কি তনুতে, কি অফিসের সুন্দরী পি এ-তে অথবা প্রতিবেশিনীতে, যা হয় আর কি, কিংবা সদ্য দেখা সিনেমার পেট খোলা, মাজা দোলানো নায়িকাতে, তার মানে আমি ভ্রষ্টাচারী। এর কোনও ক্ষমা নেই। মানুষের মনের বিচার আদালতে হয় না। শাস্তি হল ভবিষ্যৎ। বেশি দূর ছুটো না, তাহলে আবার অতটাই তোমাকে ছুটে আসতে হবে। রাখাল যদি ভুল পথে ছোটে, গরুর পালও তার পেছন পেছন ভুল রাস্তায় ছুটবে। পাপ প্রথমে সরু মাকড়সার জালের মতো, শেষে জাহাজের কাছি।

আমারও বয়েস হল। ওদিকে অমৃতার দাদারও বয়েস হয়েছে। সে ভদ্রলোক কি আমার মতো জীবন নিয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। কোন আবেগে কি সন্তান জন্মে, কি চেহারা পেয়েছে, সে নিয়ে কোনও মাথাব্যথা আছে? তাঁর জীবন যেটুকু দেখে এসেছি, তাতে মনে হয়েছে, ভদ্রলোকের জীবন দর্শন হল—চালিয়ে যাও। তারপর দেখা যাবে। বেশ বুঝেছি, জ্ঞান বাড়লে দুঃখ বাড়ে। হাবোড়তাবোড় পাঁচটা পড়লে পাওনা একটাই অশান্তি। সেই এক সাধক ভারি সুন্দর বলেছিলেন, মরার সময় বুঝলুম কেন বেঁচে ছিলুম।

দেরাদুনে অমৃতাদের ফলবাগানে প্রথম দিনটা ভালই কাটল। পরের দিন সকালেই পড়ে গেলুম অসুখে। খেয়ে অসুস্থ। অমৃতার দাদা, বউদি অ্যায়সা

খাওয়া খাওয়ালেন, একেবারে কাত। বাঙালীর পেট আর পাঞ্জাবী-খানা। দুপুরের আহারের পর দাদা বলে বসলেন, হাত অঞ্জলি করো। একটা বড় টিন থেকে আমার হাতে হুড়হুড় করে খাঁটি গব্য-ঘৃত ঢালতে লাগলেন, আরে ইয়ার খা লো। ইয়ে তো হজমী হায়। হজমী হয়ে গেল বদহজম। কি লজ্জার কথা। বাঙালীর অপমান। দুই মহিলা দু'পাশ থেকে সেবায় ব্যস্ত। জ্বর এসে গেল। বেশ মধুর অভিজ্ঞতা। চোখ মেললেই সামনে একজোড়া সুন্দর মুখ। তলপেটের ওপর একটি কোমল হাত। কপালে আর একটি। পেট ধরেছে; কিন্তু জ্বর আছে। দিশী দাওয়াই আর টোটকা চলেছে।

ওই সময় আচ্ছন্ন অবস্থায় মাকে দেখলুম। টকটকে লালপাড় শাড়ি পরে মাথার দিক থেকে মুখের ওপর ঝুঁকে আছেন। মা কখনও ও-ভাবে আমার অত কাছে আসেননি। মা আমার থেকে একটু দূরে দূরেই থাকতেন। কেন তা জানি না। মনে হয় সহ্য করতে পারতেন না।

অমৃতার বউদিকে একটু সাজিয়েগুজিয়ে দিলে বম্বে ছবির নায়িকা হতে পারত। আমি বিছানায়, আর আমাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে দুটো মেয়ে। এ যেন পাওনার ওপর উপরি পাওনা। সেই দেখেছিলুম দাওয়াইয়ের চেয়ে সেবা বড়। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, জীবন বদলাবদলি করার উপায় থাকলে আমি অমৃতার দাদা হয়ে বাকি জীবনটা এখানেই এই মেয়েটিকে নিয়ে কাটিয়ে দিতুম। সেই সময়টা ছিল চাঁদের আলোর রাত। লিচু, চেরি, আম আর আলুবখড়া গাছের ছায়ায় ছায়ায় পড়ে আছে বাগানের পথ। এপাশে, ওপাশে গোটা কতক নেয়ারের খাটিয়া। গ্রীষ্মে বাইরে শুতে ভালই লাগে। পাতা ছাওয়া আকাশ। টিপ টিপ আলোর মালা পরা মুসৌরী হিলস। বেশ বড় রকমের একটা স্বপ্ন চলে গেছে জীবনের ওপর দিয়ে। অমৃতার বউদিকে আমি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারতুম। কোলে মাথা রেখে শুতে পারতুম। অসুস্থ মানুষ সবই পারে; কিন্তু আমার সংযম। তবে মানুষের চোখ বড় ভোগী। তার ক্ষিদে আর মেটে না। ভাগ্যিস, ভগবান মানুষকে চোখ দিয়েছিলেন। তা না হলে সব আয়োজনই তাঁর মাঠে মারা যেত। ওয়াল্ট হুইটম্যান কেমন করে লিখতেন,

I believe in the flesh and the appetites,
Seeing hearing and feeling are miracles,
and each part and tag of me is a miracle.
Divine am I inside and out, and I make holy
whatever I touch or am touched from
The Scent of these arm-pits is aroma finer than prayer

This head is more than Churches or bibles or Creeds.

ওদের বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার একটাই ছটফটানি, আমার জীবনটা কেন এমন হল না। একটা বাগান। একটা বাংলো। পাঁচ ফুট ছ ইঞ্চি মাপের একটা বউ। যার চুলে সামান্য একটু টক গন্ধ। যার শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই পোশাকের শাসন মানতে চায় না। যে সব সময় হাসে। তাকালে কিছু ঢাকতে চায় না। কোথাও হাত লেগে গেলে অসভ্য বলে দূরে ঠেলে দেয় না। পা তুলে বসে থাকলে যন্ত্রণার অছিলায় মাথাটিকে তলায় গুঁজে দিলে, একটি কথাই বলে, আরে এ কেয়ারে ?

রাতে অমৃতার সঙ্গে এক ঘরেই শয়ন। আহা, আমার অসুখ না ? শরীর যে দুর্বল। কপালে হাত রেখে অমৃতা বললে, 'ফিলিং স্লিপি ?' ঘুম ? ঘুম আমার ছুটে গেছে। ঠিক পাশের ঘরে দাদা বউদির দাপাদাপি।

মাথার কাছে জানালা। অমৃতা বললে উঠে বোসো। তাকিয়ে দেখ মুসৌরী রাতে কেমন সাজে। ইট ইজ ভেরি কোল্ড আউট দেয়ার। রাতে দেরাদুনেও শীত শীত করে। অমৃতা বললে, 'সারাদিন লস্যি খেয়ে আছ। এখন কিছু খাবে ?'

পাশের ঘর থেকে অমৃতার বউদির খিলখিল হাসি ভেসে এল। সাংঘাতিক একটা কিছু হচ্ছে ও-ঘরে।

অমৃতা বললে, 'শি ইজ এ বিচ। সুন শি উইল বি প্রেগনান্ট অ্যান্ড গিভ বার্থ টু এ টুইন।'

মা যেভাবে কপালে হাত রেখে ছেলের জ্বর দেখেন, সেইভাবে অমৃতা আমার কপালে হাত রেখে বলেছিল, 'যাক, জ্বর ছেড়ে গেছে। চলো বাগানে যাই। আজ মনে হয় পূর্ণিমা। সারাদিন তো শুয়ে কাটালে। আর ঘুমোয় না।'

সব মেয়ের মধ্যেই একটা করে মা থাকে। তা না হলে পৃথিবী তো ধ্বংস হয়ে যেতো। বোলতা আর ভীমরুলের খেলা চলত। ভীমরুল বোলতার মাথা চেপে ধরে কড়কড় করে হুল ফোটায়। সব ঘিলু শুষে নিয়ে মরা বোলতাটাকে ফেলে রেখে উড়ে চলে যায়। মেয়ে ভীমরুলের হাতে পুরুষ বোলতার সেই অবস্থা হত, যদি না তাদের ভেতর একটা মা থাকত। 'সাক', 'সাক', 'অ্যান্ড সাক, অ্যান্ড ব্লিড দেম হোয়াইট।'

কঠোর সংযমী, কঠোর তপস্বীকে লক্ষ্য করে তন্ত্র বলছেন, দেখ, দেখ, সৃষ্টির উন্মেষ ভঙ্গীটা, একবার দেখ, প্রথমে একটা রক্তের ডেলা ত ভূমিষ্ঠ হল। তারপর তাকে স্তন্যপান করিয়ে, আহার যুগিয়ে করা হল পূর্ণ মানুষ। মায়ের কর্তব্য মা শেষ করলেন। শুরু হল আমির খেলা। আমি এবার বহু হব। একোহহং বহু

স্যাম। এই বহু হতে গিয়ে বউ খোঁজা। আর তারপর সেই দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী, পলক পলক লহু চোষে। যেমন ও ঘরে অমৃতার বউদি। অমৃতার দাদা বোলতাটিকে ভীমরুলের মতো ধরেছে। ভদ্রমহিলা ধরতে পারে। চেহারা দেখেই মনে হয়েছে ভিসুভিয়াস। ভেতরে লাভা আছে। ফুটছে টগবগ করে।

বিশাল বাগান। চাঁদের আলোয় পথের ওপর ছড়িয়ে আছে গাছের পাতার আলপনা। মাথার ওপর ঝনঝনে শুকনো আকাশ। পাহাড়ের কাছাকাছি বলে তারাদের কি চেহারা যেন ধকধক করে জ্বলছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে ঝিনঝিন করে। রাতের পৃথিবী যেন উর্বশীর কালো চুমকি বসানো আঁচলের মতো। বাতাসে উড়ছে। দেহে জড়িয়ে যায়। দূরে মুসৌরী ঘুমোচ্ছে। আলোর মালা পরে পাহাড় জেগে আছে একা মৌন ধ্যানে।

অমৃতা আমার কাঁধে হাত রেখে হাঁটছে। আমার মনে হচ্ছে, নারীই ধর্ম। ভালবাসাই আধ্যাত্মিকতা। সেই মুহূর্তে মনটা আমার যে-রকম হয়ে গিয়েছিল, সেই ভাবটা আজও আমার মনে ধরা আছে। সেই বয়েসটাই নেই। পরিবেশ নেই। চরিত্র নেই। অমৃতা আছে। অনেক দূরে। কানাডায়। বয়েস হয়ে গেছে। সে এখন মা। আমি যেমন বাবা।

বাগানে একটা দোলনা ছিল। পাশাপাশি দুজনে দোল খেতে লাগলুম। আমরা যখন দোল খাচ্ছি তখন ভারতের মাথার ওপর উত্তর-পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধ বেশ ঘোরালো হয়েছে। আমরা যখন দোল খাচ্ছি তখন আমার মা একটি প্রদীপ হয়ে আমাদের দোতলার ঘরে বাতাসে নিবু নিবু হয়ে জ্বলছেন।

অমৃতা বলেছিল, তুমি খুব ভাল ছেলে। সিগারেট খাও না, প্রেম করো না। আই ওয়াজ রেপড টোয়াইস। শুনে আমি হাঁ। এত সহজে একটা মেয়ে এমন কথা বলতে পারে। তার বাস্কেটবল টিচার একবার সিমলা ক্যাম্পে সুযোগ নিয়েছিল। আর একবার নিয়েছিল তার পিতার বন্ধু। যার দৌলতে তার এই চাকরি। তারপর সব কিছু উড়িয়ে দিয়ে বললে, দিস ইজ ইনএভিটেবল। হবেই। তারপর কেন হবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এমন একটা অশ্লীল কথা বললে।

বেশ কিছুক্ষণ চাঁদের আলোয় দোল খাবার পর প্রশ্ন করলে, হাউ ডু ইউ ফিল নাউ ?

ভালই বোধ করছিলুম। বললুম, ভাল।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমার ভালো হয়ে গেল মন্দ। আবার সে মন্দ এমন মন্দ যে সে মন্দর চেয়ে ভাল আর কিছু হয় না। অমৃতা বললে, 'তোমার প্রথম

অভিজ্ঞতা ?' মিথ্যে বললুম। বললুম, 'হ্যাঁ।' 'দেন লেট আস ডু ইট অ্যাগেন।'

আমি তখনও জানি না, আমার মা মারা গেছেন। আমার অশৌচ। চারিদিকে আমার খোঁজাখুঁজি চলেছে। মুসৌরী হিলসের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে শেষ রাতের হিলহিলে ঠাণ্ডা।

অমৃতাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'তুমি কেন এমন করলে ?'

স্পষ্ট উত্তর, 'আমি মানুষ বলে।'

'ধরো দিল্লিতে আমার চাকরিটা যদি হয়ে যায়, তুমি আমাকে বিয়ে করবে ?'

'কেন ?'

'আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি।'

'এক রাতেই ?'

'হ্যাঁ।'

'ভেবে দেখতে পারি।'

'কেন ?'

'বাঙালীরা খুব সফ্‌ট, রোমান্টিক, কালচারড আর ধার্মিক। আর ধার্মিক বলেই ফেথফুল।'

এখন আমি এই সব কথা ভাবি আর হাসি। আমার সম্পর্কে নীপার ধারণা ঠিক এর উল্টো। একেবারে বিপরীত। নিশ্চয় কারণ আছে। সত্যিই আমার সব আছে, একটা জিনিস নেই চরিত্র। আমি শয়তান। আমি পারভার্ট। সবাই জানে। আমার বউ জানে, ছেলে জানে, মেয়ে জানে। যতদিন গেছে, তত পাপ বেড়েছে। নিজেকে যতবার শক্ত মুঠোয় ধরতে চেয়েছি, ততবার হাত ফসকে পড়ে চুরমার হয়েছি।

জীবনের ওপর দিয়ে এক একটা দিন, এক একটা রাত চলে যায় তার আর তুলনা মেলে না। জোর করে, আয়োজন করে ফিরিয়েও আনা যায় না। জীবনের এই হল ট্র্যাজেডি। দেরাদুন আছে, বাগান আছে, অমৃতার মতো মেয়ে আছে। আমি আছি। একটু পুরনো হয়েছি ঠিকই, কিন্তু মন আছে, স্মৃতি আছে, তবু যাহা যায়, তাহা যায়। শূন্য এ বুকে পাখি আর ফিরে আসবে না।

ভোরবেলা অমৃতা বললে, রাতটা কেমন মনোহর কাহিনীর মতো কেটে গেল ! আমার এক রাতের বউ এইভাবেই হারিয়ে গেল জীবন থেকে। অমৃতার বউদির চোখ হাসি হাসি, দুষ্টু দুষ্টু। অমৃতার দাদাটা একটু ভোঁতা। গাধার মতো খাটতে পারে, হাতির মতো খেতে পারে, মানুষের মতো ভাবতে পারে না। তবু ভাল লেগেছিল মানুষটাকে। যে গাছের সঙ্গে কথা বলে, মাটির ওপর রাগ করে, ফল ছিঁড়ে নেবার আগে গাছের অনুমতি চায়, সে বড় অদ্ভুত লোক। মানুষটার

শক্তিও ছিল সাংঘাতিক। বউকে কাঁধে তুলে বললে, ওই উঁচু ডাল থেকে চেরি পাড়। আমার ক্ষমতায় কুলোবে!

তখন পনের আনা খরচ করলে বাসে দেরাদুন থেকে মুসৌরী। ঘুরে ঘুরে যত ওপরে উঠবে তত ঠাণ্ডা বাড়বে। আমার সঙ্গে গরম জামা ছিল না। অমৃতার গরমেই গরম হয়ে বসে আছি, জানলার ধারের আসনে। মুসৌরী না কি কুইন অফ হিল স্টেশানস। বাইরে কুইন, আমার বাঁপাশে কুইন অমৃতা।

লাণ্ডুরে একটা চলনসই হোটেলে ওঠা গেল। মাঝে মাঝে পয়সার চিন্তা হচ্ছিল। যা আছে তাতে কুলোবে তো! তবে হাতে ঘড়ি আছে। আঙুলে দুটো আংটি আছে। সারাটা দিন মুসৌরীর এ মাথা থেকে ও মাথা। কপুরথালার মহারাজার বাড়িটা দেখিয়ে অমৃতাকে বলেছিলুম, লটারি পেলে তোমাকে কিনে দেব। গান হিলে অপরিচিত এক ভদ্রলোক আমাদের দুজনের ছবি তুললেন, পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে। ছবিটা আমার কাছে এখনও আছে। মহাসম্পদের মতো লুকনো। চলে যাওয়া সময়ের মতো আর কি সম্পদ আছে! টাকা গেলে টাকা আসে। সময় গেলে আর আসে না। বেদনার মতো মণিমুক্ত আর কি আছে! ছিল আর নেই, এর চেয়ে বড় ঐশ্বর্য আর কি হতে পারে।

পরে আমি তিনবার মুসৌরী গেছি। প্রতিবারই মনে হয়েছে, সময়ের সমাধিতে ফুল চড়াতে এসেছি। চোখের সামনে অদৃশ্য প্রস্তর ফলকে লেখা, হিয়ার লাইজ ইন পিস দি বেস্ট মোমেন্টস অফ ওয়ানস লাইফ। ওই জায়গাটায় রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল একটি যুবক পাশে এক যুবতী। লম্বায় ইঞ্চিখানেক বড়। শরীরের কোথাও অপ্রয়োজনীয় মেদ নেই। লম্বা লম্বা পা। লম্বা হাত। অল্প অল্প লোম। সে ছেলে হতে হতে মেয়ে হয়ে গিয়েছিল। কোনও মেয়েলী ন্যাকামো ছিল না। সে যখন বলত, কাম টু মি। একটা হাত বাড়িয়ে দিত। আমার কুকুরটা ছটফট করে ন্যাজ নাড়ত। সে যদি বলত ডাই ফর মি, আমি লালটিব্বা থেকে লাফিয়েও পড়তে পারতুম। শি ওয়াজ মাই মাস্টার, আই ওয়াজ হার ডগ।

পাঁচটা বাজে থার্ড ক্লাস জিনিস তখনও পড়া হয়নি, তাই বুঝিনি। এখন জেনেছি, অমৃতা মনে হয় সমকামী ছিল। মুসৌরী থেকে আবার আমরা দেরাদুন ফিরে এলুম। অমৃতার দাদা দুপুরে মটোরবাইক চেপে চলে গেলেন শহরে। আমি বাগানে একা একা ঘুরছিলাম। পরের দিনই দিল্লি ফিরব, তাই যতটা পারি ভোগ করেনি। বাংলোর ঘরে একই খাটে পাশাপাশি শুয়ে আছে অমৃতা আর তার বউদি। আমি বাগান থেকেই শুনতে পাচ্ছি দুজনের খিল খিল হাসি। গাছপালাও প্রকৃতি, নারীও প্রকৃতি। নরের নারীর প্রতিই আকর্ষণ বেশি। অন্যের

ব্যাপার জানি না। আমার ছোঁক ছোঁক স্বভাব বেড়ালকেও হার মানায়। আর এই লুকিয়ে দেখার বদ অভ্যাসটা সেই সময় থেকেই চরিত্রে ঢুকেছে। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। মাঝে মাঝে ধরা পড়ে যাই। লজ্জা পাই। অপমানিত হলেও আমি অসহায়। এ আমার স্বভাব। বিলেত হলে বলত 'ভয়ুরিস্ট'। আমার ভেতর যত পাপ, সবই সায়েবী পাপ। পাপে আমি সায়েব, চেহারায় আমি 'নিগার'।

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে, খোলা জানালার দিকে তাকালুম। অমৃতা খেলা করছে। তার বউদির শরীর নিয়ে খেলছে। অনেকটা পুরুষের মতো। প্রবীণের শাসন না থাকলে নবীনের এই অবস্থাই হয়। আমার পরিবারে এখন যা হয়েছে। আর চরিত্র না থাকলে শাসিত শাসন মানবে কেন। গাছের আড়ালে আমি স্থাণু ? খোলা জানলায় দুই মহিলার রঙ্গ। একালে বিলিতি বইয়ের পরিচ্ছদ।

দিল্লি ফেরার পথে অমৃতা বললে, 'বিয়ে, সংসার এসব আমার ভাল লাগে না। বড় একঘেঁয়ে। বিয়ে, ছেলে, মা, আবার, হয় তো আবার, মানুষ করো, সেবা করো, ডিসগাসটিং। আনন্দ করার জন্যে জন্মেছি। ফুরিয়ে গেলে চলে যাব। তোমার কি মত !'

বুঝলুম অমৃতা পাশ কাটাতে চাইছে। দিল্লি যত এগিয়ে আসছে, অমৃতা তত দূরে সরছে। তনুর বাবা দুঃসংবাদ দিলেন, 'তোমার চাকরিটা মনে হয় হয়েও হবে না। চীনে হামলার জন্যে রিক্রুটমেন্ট বন্ধ হতে চলেছে। তবে আমি খুব চেষ্টা চালাচ্ছি।'

কি দুর্মতি হল, বলে ফেললুম, 'আপনার মেয়েকে আমি কিন্তু বিয়ে করতে পারব না।'

ভদ্রলোক ঠাস করে একটা চড় মারলেন, 'তোমাকে কে বলেছে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে। তুমি আমার মেয়ের চেয়ে হাজার গুণ ভালো মেয়ে পাবে। আমার ছেলে নেই, তাই তোমাকে ছেলের মতো ভালবেসে ফেলেছি। অপত্য স্নেহের তুমি কি বুঝবে ইডিয়েট !' ভদ্রলোক কেঁদে ফেললেন। তনুর বাবার মতো এমন অদ্ভুত মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। কমলালেবুতে যিনি রস ঢেলেছেন, আমড়াকে যিনি আঁটিসার করেছেন, সুপুরিকে যিনি পাথর করেছেন, করমচাকে যিনি টক করেছেন, উচ্ছেকে যিনি তেঁতো করেছেন, কোনও কোনও মানুষকে যিনি হৃদয়হীন পশু করেছেন, তিনিই আবার কোনও কোনও মানুষকে করেছেন মৌচাকের মতো মধুর নির্ঝর। পৃথিবী সেই মানুষটিরই খেলা। যাঁকে সবাই ঈশ্বর বলে। এই বোধ আমার তখনই হয়েছিল। যে ঘটে যা ঘটাও, সেই ঘটে তাই ঘটে। জগৎমাঝে তব পটিয়সী মায়া, ঘটেপটে রটাও তোমার মহিমা।

এই হাত যদি পুষ্পাঞ্জলি দেয়, তোমার ইচ্ছা, এই হাত যদি স্তনমর্দন করে সেও তোমার ইচ্ছা। আর সেই বিশ্বাসের জোরেই আমি শয়তান।

তনুর বাবার সঙ্গে আমারও চোখে জল এসে গেল। আমার জন্যে এইভাবে কেউ কোনওদিন ভাবেনি। এই ভাবে সপাটে কেউ কোনওদিন আমাকে চড় মারেনি। তনুর মা স্নান করছিলেন, গোলমাল শুনে কোনও রকমে গায়ের ওপর শাড়িটা ফেলে চলে এসেছেন। আবেগে আমার চোখে জল। মনে তিনি। অথচ ঝাপসা চোখ তার নিজের কাজে ব্যস্ত। তনুর মায়ের ভীষণভাবে অনাবৃত শরীরের ফটো তুলে চলেছে। মাথার ডার্করুমে একের পর এক প্রিন্ট হচ্ছে। পা, নিতম্ব, পুরোবাহু, ঘাড়, বুক, কোমর, চুল, রঙ। মানুষ একটা কম্পিউটার নিয়েই জন্মায়। সেখানে নারী জরীপের ডাটা আগে থেকেই ভরা থাকে। সবাই মা। কিন্তু নিজের মায়ের দিকে কেউ কুনজরে তাকায় না। আমার চোখে জল, অথচ ভাবছি, তনুর বাবা স্বচ্ছন্দে আরও দশটা বছর এই নারীকে ব্যবহার করতে পারেন।

আমার এই বিটকেল স্বভাবের জন্যে, কোনও পরিবারে যেতে ভয় পাই। আমার নজর ভাল নয়। হায় আঁখ। সেই মুখ মুখ নয়, যে মুখ হরির গুণগান না করে, গলতি বাত বলে। সেই মুখ মুখ নয়, যে মুখ অষ্টপ্রহর তাঁর নাম না নেয়। সেই চোখ চোখ নয় যে হরি রূপ ছাড়া অন্য কিছু দর্শন করে। মনের এক কোঠায় এই সব, আবার অন্য কোঠায় ওই সব। দু কামরায় দু'ঘর ভাড়াটে। না একজন বাড়িঅলা আমি ভাড়াটে। না কে যে কি, বোঝে কার সাধ্য। দুটোতে দিন-রাত কাজিয়া।

রাগেচ্ছাসুখদুঃখাদি বুদ্ধৌ সত্যাং প্রবর্ততে।
সুষুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদুবুদ্ধেস্তু নাত্মনঃ ॥

মোহ, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, বেদনা, মনের আর আর যে সব অবস্থা, সবই বুদ্ধি আর মনের ক্রিয়া। যেই ঘুমোলে সব চলে গেল। কারণ গভীর নিদ্রায় মন নিষ্ক্রিয়। তা হলে ওই সব ময়লা হল মনের, আত্মার নয়। আত্মা শুধু ধুকপুক করে চলেছে। নিরাসক্ত যোগী। যা ব্যাটা, তোর ল্যাঠা তুই সামলা। দেহ-খাঁচায় বদ্ধ মায়ায়।

তনুর মায়ের গালে সাবানের ফ্যানা। বগলের পাশ দিয়ে মসৃণ অঙ্গ বেয়ে জলের ফোঁটা নামছে। হালকা হলুদ রঙের ভিজে শাড়িতে দেহের খাঁজখোঁজ। আমার চোখে জল, মনের দুটো দরজাই হাট খোলা। একজন বলছে তাকাসনি, আর একজন বলছে দৃষ্টিতে ভোজন। কার ভজনা গবেট ভজা।

সারাটা জীবন ভেতরে এক ব্যাটা ধুনুরী বসে বসে তুলো ধুনে গেল।

তনুর মা ওই অবস্থায় আমার দিকে এগিয়ে এলেন, 'তুমি ছেলেটাকে মারলে ?'

আমার গালের লাল জায়গায় তাঁর শীতল কোমল হাত। আমি আর পারলুম না। তাঁর ভিজে নরম বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠলুম। কখনও মনে হচ্ছে মা, আকাশে মেঘ আসছে, মা নয় নারী। শৈশবে তনুর মুখ থাকত এখানে। তিনটেই মানুষের মুখ, একটা তনুর, একটা তনুর বাবার, একটা আমার। বুক একটাই মুখ তিনটি। তখনও আমি জানি না, আমার মা নেই চলে গেছেন। আমার অশৌচ। খোঁজপাত চলেছে চারদিকে।

তনুর মা বললেন, 'কবে যে তোমার বুদ্ধি হবে ?'

আমি নিচু হয়ে তনুর মাকে প্রণাম করলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কাঁচের সব ময়লা ধুয়ে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির জন্যে আমার মন ছটফট করে উঠল। যেন শুনতে পেলুম, কেউ ডাকছে, ওরে তুই চলে আয়, শিগগির আয়।

হাওড়ায় নেমে বাড়ির দিকে আসছি। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে নেমে আমাদের বাড়ি ছিল মিনিট দশেকের হাঁটা পথ, মানে প্রায় মাইলখানেক। পথে পড়েই বুকটা কেমন যেন ছ্যাঁত করে উঠল। চারপাশ নির্জন। বড় নির্জন। দুপাশে পুরনো পুরনো বাড়ি। পাচিলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে আছে গাছের ডালপালা। যত দূর দৃষ্টি যায় কালো পিচের পথে সাদা সাদা খই আর ফুলের পাপড়ি আলপনার মতো ছড়ানো। মৃদু বাতাসে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। আমি আসার আগেই এই পথ দিয়ে কেউ চলে গেছেন চির-যাত্রায়। তখনও জানি না, কি দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছে বাড়িতে।

মা নেই। লাল পাড় শাড়ির আঁচল নেই। চাবির শব্দ নেই। কণ্ঠস্বর নেই। মনুর মা কেটলিটা দিয়ে যাও। সন্ধ্যা বাবাকে চাটা ছেঁকে দে। নানা আদেশ, নানা উপদেশ, সব স্তব্ধ। একটি মাত্র মানুষের জন্যে সারা বাড়ি খাঁ খাঁ করছে। চলে যাবার পর বুঝলাম কি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দিয়ে মা বাড়িটাকে ছেয়ে রেখেছিলেন ! বাবার চেহারা অসম্ভব ভেঙে গেছে। আমার দিকে অবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। পাথরের মতো মুখ। কিছু একটা বলতে চাইছেন। ঠোঁট কাঁপছে। অতি কষ্টে শুধু বলতে পারলেন, 'সব শেষ।' তারপর চোখ দিয়ে হুহু করে জল নামল।

আমার মন, সত্যি আমার মন কি অসম্ভব বিকৃত। মাথা শূন্য। মা নেই। আচমকা আঘাতে ভেতরটা ফুলছে। হুহু করছে। দিল্লির আঁধি ছুটছে মনে, সেই অবস্থাতেও ভাবতে পারলুম, বাবার এখনও এমন স্বাস্থ্য, জীবনীশক্তিতে ভরপুর,

কি ভাবে জীবনের বাকি রাত কাটাবেন ? আমার নীপা আছে। বহু দূরে অমৃতা আছে। ক্ষণিকের চিন্তা, তবু কি বিশ্রী তার গতি ?

মাখী চন্দন পরিহরৈ জহঁ বিগন্ধ তহঁ জহি।

মাছি চন্দন ছেড়ে যেখানে দুর্গন্ধ সেখানে যায়। মাতা জুঠা, পিতা ভী জুঠী জুঠে হো ফল লাগে। মা এঁটো, বাপও এঁটো, তাদের থেকে যে ফল উৎপন্ন হল তাও এঁটো। তাহলে ? কবীর বলছেন, পণ্ডিত তুমিই বলো কি করবে, সবই তো এঁটো, উচ্ছিষ্ট, ভুক্ত, জুঠি। তা আমার কি হবে ? আমি যে মানুষের প্রথম পাপের ফসল !

বিপদ একা আসে না। দলবল নিয়ে মহাসমারোহে আসে। প্রথম এল দিল্লির চিঠি। তনুর বাবা লিখছেন, তালিকার প্রথমেই তুমি আছ। চাইনিজ অ্যাগ্রেসানের জন্যে সব আটকে আছে। ভেবো না আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। মানুষ হতাশার অলিন্দ পেরিয়ে আশার সোপানে উঠতে চায়। ধাপ ভেঙ্গে ভেঙ্গে সেই নীল কাঁচের ঘর। ভেঙ্গে যাবে একদিন তবু যেতে চায়! মনের খাঁচা খুলে আশা-পাখিটাকে উড়িয়ে দিতে পারলেই আজীবন শান্তি। পুরুষের কর্ম নয়, মহাপুরুষ পারেন।

দ্বিতীয় বিপদটি এল আচমকা, অন্যদিক থেকে। এক চক্ষু হরিণের দৃষ্টি সেদিকে ছিল না। মায়ের শ্রাদ্ধশান্তি সমাপ্ত। মাথাটা মসৃণ করে কামানো। ভরাট মুখে চুল ফেলে দিলে বেশ একটা সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী চেহারা হয়। ঢাকা আর পাকা নর্দমাকে যেমন মনে হয় পথ। ভেতরের ভড়ভড়ে পাঁকের সন্ধান পাওয়া যায় না। বসে আছি আমার সেই ছাদের চিলেকোঠায়। কোণের দিকে সেই সুন্দরীর ছবি। ঝুলঝাড়া হয়নি বেশ কিছুদিন। আমার সমস্ত অপকর্মের নীরব সাক্ষী।

সেই ঘরে হঠাৎ এসে ঢুকল নীপা। বাঘ মাংসকে আহার ছাড়া কিছু ভাবতে পারে ? সে ন্যাড়া বাঘই হোক কি ন্যাজ কাটা বাঘ হোক ! নীপা। দেখেই মন দুলে উঠল। বছরে একবার বসন্তের টিকে দিতেন এক পুরকর্মী। একটা রকে এসে সাজ সরঞ্জাম নিয়ে বসতেন। লোকের পর লোক আসছে। মেয়েরা আসছে। কার কি মুখ চোখ চেহারা কিছুই দেখার দরকার নেই। দেখছেনও না। তাঁর এক কথা—তোলো। তোলো মানে হাতা তোলো। স্পিরিট ভেজানো তুলো ঘষে, একফোঁটা ভ্যাকসিন তারপর গোল একটা সিল খুড়ুক করে ঘুরিয়ে দেওয়া, দিয়েই বলা, নেক্স্ট ম্যান। তা কাউন্সিলার এসেছেন দেখতে। কেমন হচ্ছে আর কি। ভদ্রলোক বললেন, তুলুন তুলুন। হাতে স্পিরিট ভেজা তুলো।

নীপাকে দেখা মাত্রই আমার বিমর্ষ, বিষণ্ণ মন যেন বলে উঠল, তোলো

তোলো। গালে চড় মারা যায়, মনে তো আর চড় মারা যায় না। ঢোঁক গিলে সামলাতে হয়। নীপার মুখে তেমন হাসি নেই। তপতপ করছে সারা মুখ। উড়ু উড়ু চুল। ভাবলুম আমার শোকে শোকার্ত। আহা, ভালবাসার সেই তো ধর্ম! দুটো দেহ হৃদয় একটা। নীপা আমার পাশে এসে, গায়ে গা লাগিয়ে, পা ছড়িয়ে বসল। এতক্ষণ মায়ের কথাই ভাবছিলুম। মাঠের বাইরে মারা বলের মতো মায়ের চিন্তা সাইড লাইনে চলে গেল। গায়ে গায়ে নীপা। ত্বকে ত্বকে নীপা। দেহের উত্তাপ। চুলের গন্ধ। শরীরের পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা।

ধ্যাত্ তেরিকা মা। মন, দেহাশ্রিত মন কি মারাত্মক! প্রথমে চমকে উঠলুম। এমন একটা কথা মনে এল! এই হল মানুষের ছেলে! মাতা জুঠী, পিতা ভী জুঠী, জুঠে হো কল লাগা। ধর্ম আর দর্শনকে মানুষ কি চমৎকার নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে। নীপা এল। আলুথালু পাশে বসল গায়ে গা লাগিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমি শক্ত। কবীর এলেন। বললেন, মানুষের জন্ম এঁটো। কামোচ্ছিষ্ট। কুলগুরু কৃপানন্দের মুখে শোনা শঙ্করস্তোত্র ভেসে উঠল মনে। আমার একটা হাত নীপার কাঁধ আর খোঁপার ওপর দিয়ে ঘুরে গিয়ে আঙুল ওপাশের বুকের ওপর খেলা করছে। ক্রমশই আমি কঠিন হচ্ছি। বৈদান্তিক হয়ে উঠছি, দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতশিশির বসন্তৌ পুনরায়তঃ। সূর্য উঠবে, সূর্য ডুববে, জীবনসূর্য, আলো থেকে অন্ধকার। শীত আর বসন্ত, প্রভু! আসে যায় ॥ সময়, সে তো বহতা নদী, কুলু কুলু খেলে যায়। যৌবন, জরা ছুঁয়ে মৃত্যুর মহান্ধকারে চলে যায় ॥ জীবনের বৃথা আশা, অশান্ত অগ্রপথিক। ক্লান্তিহীন চলেছে চলেছে! মূর্খ! ভজ গোবিন্দ, ভজ গোবিন্দ, জপ গোবিন্দ। অন্তকাল জীবনের ব্যাকরণ বৃথা হয়ে যায় ॥

নীপার বিশাল খোঁপা সহ মাথা আমর কাঁধে। আমার হাত, কখনও ধরছে, কখনও ছাড়ছে। টাটকা জীবন আর বাসী মৃত্যুর মাঝে বসে আছি পাপী শ্রীচৈতন্য। মনে পড়ছে গল্প, রবিবার এক ধর্মযাজক একগৃহে এসেছেন প্রার্থনা সভায়। প্রার্থনা পরিচালনার সময় তাঁর ছেলেটি মারা গেল। স্ত্রী কি করলেন! মৃত সন্তানটিকে চাদর চাপা দিয়ে রাখলেন। ধর্মযাজককে কিছুই জানালেন না। সভা শেষে তিনি গৃহে এলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন—ছেলে কোথায়? স্ত্রী বললেন, পড়তে গেছে। যাজক বললেন, সেখানেও তো দেখলুম না। স্ত্রী স্বামীকে পানীয় দিলেন। খাওয়া শেষ করে আবার প্রশ্ন—ছেলে কোথায়! স্ত্রী বললেন, 'তুমি ভেব না। অন্য কোথাও গিয়েছিল, এখন ফিরে এসেছে। তুমি আগে খেয়ে নাও।' স্ত্রী আহার পরিবেশন করলেন স্বামীকে। যাজক খেতে যেতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে লাগলেন। স্ত্রী তখন বললেন, 'তোমাকে

একটা প্রশ্ন করব ?' যাজক বললেন, 'করো।' আজ ভোরে, একজন এসে আমার কাছে একটা জিনিস রেখে গিয়েছিল। এখন এসেছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কি করব! দোব না রেখে দোব ?' যাজক বললেন, 'রাখবে কেন ? যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দাও।' তখন স্ত্রী বললেন, 'তোমাকে না দেখিয়ে ফেরত দেব কি করে! তুমি এস।' স্বামীর হাত ধরে বিছানার কাছে নিয়ে এলেন। ধীরে ধীরে চাদরটি সরালেন। বিছানায় মৃত পুত্র। যাজক কেঁদে ফেললেন—স্ত্রী বললেন, 'সে কি তুমি কাঁদছ! তুমিই তো একটু আগে বললে, গচ্ছিত জিনিস মালিককে ফিরিয়ে দাও, আর তুমিই না বলতে দেনেঅলাও ঈশ্বর, লেনেঅলাও ঈশ্বর। সবই তাঁর মহিমা।'

এই তো সেই মহিমা। মাকে যিনি নিয়েছেন, নীপাকে তিনিই এনে দিয়েছেন।

নীপা কানের কাছে ফিসফিস করে বললে, 'মনে হয় বিশ্রী একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। খুবই চিন্তার কথা। সেদিনের ঘটনায় আমি মনে হয় মা হতে চলেছি।'

তন্ত্র বলেন মানুষের মেরুদণ্ড হল একটি সর্প। একটি নয় তিনটি, পাশাপাশি। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। মূলাধারে তার ত্রিকুণ্ডলী। ভুজঙ্গরূপিণীং দেবীং নিত্যাং কুণ্ডলিনীং পয়াম্। ডাকিনী, রাকিনী, শাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, হাকিনী। একটা আগে পর্যন্ত নীপা ছিল আমার কুণ্ডলিনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অন্তত আমি সেই ভাবেই দেখে পাপকে মহাপুণ্যের চেহারা দিতে চাইছিলাম—

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং তত্র ইষ্টদেবস্বরূপিনীম্।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাং।
নবযৌবন সম্পন্নাং সর্বাভরণভূষিতাং।
পূর্ণচন্দ্রনিভাননাং সদা চঞ্চললোচনাম॥

সেই দেবী অবিবাহিতা পোয়াতি। পোয়াতি শব্দটাই মনে হল কারণ 'ভালগার'। দেবী-গর্ভবতী শুনে ষটচক্র ভেদ করে যে সর্প সহস্রারে মাথা তুলছিল, ভয়ে আতঙ্কে লটকে পড়ল। সত্যিই মনে হল আমার মেরুদণ্ড হিম-সর্প। সর্বনাশ! বলে কি। খুব ছোটলোকের জীবনে এমন ঘটনা ঘটে। বস্তিটস্তিতে ঘটে। ভদ্রপরিবারে হলে মুড়ো ঝাঁটা। সপাসপ। সোজা ঘাড় ধরে, পোঁদে লাথি মেরে ছেলেটাকে বের করে দাও। মেয়েটাকে পাঠিয়ে দাও দূরে কোনও আত্মীয়ের বাড়ি। যে রোগের যে দিশি দাওয়াই।

সর্বনাশের সংবাদ পেশ করে নীপা প্রায় শুয়েই পড়ল আমার কোলে। যেন আমি রেকগনাইজড বাপ, সে রেকগনাইজড মা। আরে একে যে বলে অ্যাডাল্টারি। ব্যভিচার! কিন্তু বাবা আমি দায়ী নই। সেণ্ট অ্যামব্রোজ বলেছেন, Adam was led to sin by Eve not Eve by Adam. নীপা বুঝছে না

কেন যে আমাদের শিশুটিকে কেউ যীশু বলে মেনে নেবে না ? সেই ঘরে ধীরে ধীরে সেদিন সন্ধ্যা নেমে এল। আলো জ্বালাবার কেউ নেই। দু'জনেরই প্রশ্ন, কি হবে ? আমি নীপাকে গেঁথে ফেলেছি। নীপা আমার টোপ গিলেছে।

এ সব ব্যাপার বেশিদিন চাপা থাকে না। মাঠে বীজ ফেললে নিঃশব্দে অঙ্কুরোদ্গম। মনু বলেছেন নারীও ভূমি, পুরুষ হল বীজ। রাবেলে লিঙ্গকে বলেছেন, 'নেচারস প্লাউমান'। 'ফ্যালাস প্লাউশেয়ার অ্যাণ্ড ওম্যান ফারো'। আঁদ্রে ম্যাসনের বিখ্যাত ছবি, কোদাল হাতে পুরুষ, তুমি নারীর কেশাবৃত যোনিদেশ। সে তো দর্শন, সে তো শিল্প। বাস্তব অতি কঠিন। মানুষ নিঃশব্দে, অগোচরে, রাত্রীর মধ্যযামে, শিরিভেজা প্রান্তরে, বীজাঙ্কুরের মতো মাথা তোলে না।

এই শুভসংবাদটি একদিন আমার পরিবারে ছড়িয়ে পড়ল লঙ্কা ফোড়নের ঝাঁজের মতো। একই সঙ্গে হাঁচি, কাশি। অজস্র ছিছিকার, ধিক্কার। আত্মীয় স্বজনরা দেখলেই দূরে সরে যান। মেয়েদের সামলান। আমি যেন মা শীতলা। ধরলেই মায়ের দয়া। অবশেষে একদিন পিতার মুখোমুখি। পাথরের মতো মুখ। স্থির অচঞ্চল দৃষ্টি। তিনটি মাত্র শব্দে তাঁর ঘৃণা প্রকাশ পেল, ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ।

আমার শিক্ষা দিয়ে, দীক্ষা দিয়ে, রুচি, সংস্কৃতি, আদর্শ দিয়ে যে কোঠাটি তৈরি করেছিলুম, সামান্য একটি জৈব দুর্বলতায় ধুস্ করে ধসে গেল। আর ঠিক সেই সময় নীপার বাবা এলেন ছুটিতে। ভেবেছিলাম, তিনিও জুতোপেটা করবেন। হাসতে হাসতে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, এ গুড ম্যাচ। খুব ভালই হয়েছে। একটু আগে আর পরে। ঘোড়ার আগে গাড়ি আর গাড়ির আগে ঘোড়া। পেতে ফেল সংসার। ও আর সানাই টোপরে দরকার নেই। রেজেস্ট্রি করিয়ে নাও।

পিতার মুখে যে রাতে তিনটে ছি শুনলাম, তার পরের সকালেই গৃহত্যাগ।

ফল গাছকে ভুলতে পারে না। সেই যে অসহায় বোধ, সেই বোধটা আজও আমাকে তাড়া করে ফিরছে। কেউ কোথাও নেই। কাটা ঘুড়ি ভেসে চলেছি আকাশে। স্নেহ তত দাগ কাটে না, যত কাটে ঘৃণা। সেই যে বাড়ি ছেড়েছিলুম, চৌকাঠ আর ফিরে ডিঙোয়নি। কে বেঁচেছে, কে মরেছে, সে খবর আর নিইনি।

চীনে হামলায় চাকরি আটকে গেছে। রোজগার গোটাকতক টিউশানি ছিল। তাও গেছে। তখনও সব বলত চরিত্র গেল তো, মানুষের সবই গেল। ইংরিজিতে বলত, হোয়েন মানি ইজ লস্ট নাথিং ইজ লস্ট, হোয়েন হেলথ ইজ লস্ট সামথিং ইজ লস্ট, হোয়েন ক্যারেকটার ইজ লস্ট এভরিথিং ইজ লস্ট। এখন আর বলে না। আমার মনে হয় কন্ট্রাসেপটিভ না এলে আমার মেয়ে এই

অবিবাহিতা অবস্থায় তিন চারবার মা হয়ে যেত। আমার ছেলে বাবা। ওম্যানস লিব, ফ্রিসেক্স, ড্রাগস আর ড্রিংকস এ যুগের ফ্যাশন। এখন যদি বলা হয়,

Hear, my son, your father's instruction
And reject not your mother's teaching
For a graceful garland will they be for your head
And a chain for your neck.

একালের ছেলে ব্যঙ্গের চোখে তাকাবে। একটু সরে গিয়ে বলবে বুড়ো ব্যাটা বাতেলা মারছে। আমার মেয়ে বিকট বিকট ছেলেদের মটোরবাইকের পেছনে চেপে ঘুরে বেড়ায়। এর নাম না কি ডেটিং! আমার ছেলে জিনস্ পরা মেয়েদের বাড়িতে টেনে আনে। তুই তুই করে কথা বলে। এদের মধ্যে কেউ আচমকা মা হলে, পাকাপাকি ঘরে এনে তুলবে। বলবে, ইফ ইউ ফিল আনইজি লুক ইওর ওয়ে। পরিষ্কার বাঙলা, পথ দেখ বাবা।

আমার গর্তে পড়াটাই বড় হল, আমার স্ট্রাগলটা কিছুই নয়। কথায় কথায় সব বলে তুমি কি করেছিলে! আমি আর যাই করি কারুর অসুবিধে করিনি। গাছের অপমান করিনি। বৃন্তচ্যুত হয়ে চলে গেছি। বাসা ছেড়ে উড়ে গেছি। নীপাকে ছেড়ে পালায়নি। স্বীকার করেছি পিতৃত্ব। চোষক যন্ত্রে ফেলে পনের মিনিটে আবার তাকে কুমারী করে দিইনি।

ছেলেবেলা থেকেই মানুষের ঘর সংসার যেখানে গড়ে ওঠে সেইখানেই গাছের মতো শিকড় নেমে যায়। উৎপাটিত হলে বড় কষ্ট হয়। বেঁচে থাকার জন্যে কসরত করতে হয় অসম্ভব। কোথায় যাই, কি করি, কোথায় যাই, কি করি করে দিন পনের কেটে গেল। সে এক মজার জীবন। বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে গেলে, দু চারটে প্রথামাফিক কথার পর সব গম্ভীর। বুঝিয়ে দেয় ঠারে ঠোরে, সরে পড়। সুবিধে হবে না এখানে। নিকট আত্মীয়দের কাছে অচ্ছুত। দূর আত্মীয়রাও খবর রাখতেন। গোটাকতক মামুলি প্রশ্ন। আচ্ছা এবার এসো। আবার এসো।

একটা মানুষের কোথাও যাবার জায়গা নেই। কোথাও থাকার জায়গা নেই। আশ্চর্য ব্যাপার। সারা পৃথিবীটাকে মানুষ দীর্ঘ চেষ্টায় রুমালের মতো টুকরো টুকরো করেছে। তার ওপর এক একটি রুদ্ধ কক্ষ পরিবার। নো এন্ট্রি। কুকুর তবু মানুষের চাতালে আশ্রয় পায়। মানুষ এসে বসলেই হাজার প্রশ্ন। বেরিয়ে এল লাঠিসোঁটা। তোমার মতলব! যে দেয়ালের আড়ালে মানুষের বসবাস তার গাঁথনিতে ইট নেই আছে সন্দেহ, আছে প্রশ্ন। তুমি কে? স্বার্থের চুক্তিই হল দরজা খোলার চিচিংফাঁক মন্ত্র।

কিছুদিন আগে আমাদের বাড়িতে একটি ছেলে কাজে লেগেছিল। বেশ কাজের লোক ছিল। প্রথম প্রথম ভীষণ প্রশংসা। সে ছাড়া জগৎ অন্ধকার। পরে লোকমুখে প্রকাশ পেল ছেলেটি তার ডবল বয়সী এক মহিলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সেটা তার ব্যক্তিগত জীবন। তবু সে বিতাড়িত হল। বেরো বেটাচ্ছেলে। বেরিয়ে তার ভালই হয়ে গেল। যোগাড়যন্ত্র করে পেয়ে গেল জুটমিলে চাকরি।

কালীঘাটে গিয়ে সিঁদুর পরিয়ে আনল মহিলার মাথায়। সোজা সমাধান। স্বামী-স্ত্রী, একচালার একটি খুপরি। ঘটিবাটি ছেঁড়া মাদুর, চট চ্যাটাইয়ের সংসার।

ভদ্রলোক যাকে চরিত্রহীন ছোটলোক বলে দূর করে দিল, সেই ছোটলোকের দরজাই খোলা পড়ল আমার মতো ভদ্রলোকের ছেলের জন্যে। ছেলেটি নিজে প্রেমিক। প্রেমের মর্ম বোঝে। ও বাড়িতে আমাকে ছোটবাবু বলত। সেই সম্বোধনই রয়ে গেল। আমার বিপদের সময় সে আর তার বয়স্কা বউ যা সাহায্য করেছিল, জীবনে ভুলব না।

প্রথম প্রথম তাদের ডেরায় আমার কেমন যেন একটু গন্ধ গন্ধ লাগত। মহিলা সংসারটিকে সুন্দর গুছিয়েছিলেন। কুলুঙ্গিতে দেবতা। শস্তা ধূপের ধোঁয়া। সিঁদুর মাখা মা লক্ষ্মী। দড়ি দিয়ে লম্বা-লম্বি বাঁশ ঝুলিয়ে পাটপাট জামাকাপড়। শস্তা কাঠের চৌকিতে নকশী কাঁথার শোভা। দরজার সামনে বাবুদের বাড়ির ফেলে দেওয়া পাপোশ। আধভাঙ্গা টিনের চেয়ারের ওপর কাজ করা আসন। সব কিছুই অতুলনীয় গোছানো, পরিচ্ছন্ন, কিন্তু জানলার ওপাশে খোলা ড্রেন। গলির ছড়ানো আবর্জনা, স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ। অবশ্য তিনদিনেই সব সহ্য হয়ে গেল। খেটেখাওয়া, স্বাধীন আর ঝানু মহিলাটি আমার সামনে অকারণ সরমে জড়োসড়ো হয়ে থাকত না। ব্যবহারে সহবত না থাকলেও আন্তরিকতা ছিল। ছেলেটির প্রতি মহিলার তেমন আকর্ষণ হয়তো ছিল না : কিন্তু ছেলেটির ছিল। মহিলার পোড় খাওয়া শরীর। পাকা মুখ, টেপা নাক আর খোলামেলা ভাব, পুরুষালী গলার প্রেমে ছেলেটির একেবারে পাঁকে পড়া অবস্থা। স্বামী না বলে ন্যাওটা ছেলে বলাই ভাল।

মেয়েটি এর আগে তিনটে সংসার করেছে। সময় পেলেই আমাকে সংসারের উপদেশ দিত। এমনও বলত, মেয়েদের বিশ্বাস কোরো না। রাশ আলগা কোরো না। চোখে চোখে রেখ। পুরুষ হল শিকারীর জাত। সবচেয়ে বড় আশ্চর্য, ওই মহিলাই আমাকে বলেছিল, নিজের ভুলে আপনি ওর সাহস বাড়িয়ে দিয়েছেন। ও মেয়ের স্বভাব আমাদের মতো হয়ে যাবে। ঘরের বউয়ের মতো হবে না, হবে

নরমগরম। মাটির গাছ আর টবের গাছে অনেক তফাত। মাটির গাছে ফল ধরে। টবের গাছ শুধুই বাহার। মেয়েরা হল পাহাড়ী নদী। বাঁধতে পারলে চাষবাস, মাছ, পোনা। ছেড়ে দিলেই বানবন্যা। সবাই আমাকে বলে ছেলে ধরা। তা আমি করব কি, আমার গতরের দোষ ছোটবাবু। কেউ মা বলে এল না। মিনসেরা সব মাগী বলে তেড়ে আসে। তাই তো ছেলের বয়সী ছেলেকে ধরেছি। রাতে খোলা থাকলে বড় উপদ্রব। ওই জন্যে মেয়েদের বলে বিছানা খালি রাখবে না। কিছু না থাক একটা খ্যাংরা রাখবে।'

মার্কোপোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত মহিলা পড়েছে কি! তিব্বতে তিনি দেখেছিলেন, কেউ কুমারী-বিবাহ করে না। যে নারী কখনও পুরুষের কামোদ্রেক করেনি, সে তো অক্ষম, অনাকর্ষণীয়। মার্কোপোলোর তিব্বতে অনাস্বাদিতা মহিলার বিয়ে হত না। আবার কুমারী মাতার কদর ছিল আরও বেশি। মার্কোপোলোর তিব্বতে আমি তো তাহলে নিরপরাধী বীর। তবে একালের এই ঝানু মহিলার আশঙ্কা অমূলক নয়। নীপা আমাকে ফাঁদে ফেলেছে। প্রচণ্ড তার আকর্ষণ, অসংখ্য তার ছেলে বন্ধু। সে এগোতে জানে। সে টানতে জানে।

একদা আমাদের বাড়ির সেই ভৃত্যটি, যে এখন মায়ের বয়সী এক মহিলার সঙ্গে সুখী সংসারী, সেই ছেলেটি বড় বড় তিনটি বাড়িতে আমার জন্যে টিউশানি যোগাড় করে দিলে। তার মধ্যে একজন হলেন তার মিলের বড় সাহেব। ছেলেটি কেবলই বলত, 'তুমি কিছু ভেবো না ছোটবাবু। আমি আছি। হাম হ্যায়। তুমি ইচ্ছে করলে কালীঘাটে গিয়ে কালই বিয়ে করে আনতে পার। ভেরি ইজি।' ছেলেটি সামান্য টুকটাক ইংরেজি জানত। মিলে ঢুকে সেই ইংরেজি আরও ঝালাই হয়েছে। সব চেয়ে মজা লাগত রবিবার দু'জনে সেজেগুজে যখন সিনেমায় যেত। ছেলেটা একহারা ছিপছিপে আর বউ, সে বেশ দোহারাসোহারা, এই পেটা চেহারা। এখনকার কালে অমন চেহারার একটাই বিশেষণ, সেক্সি। সে যখন বুক চিতিয়ে রাস্তা হাঁটত, মনে হত, সকলকে বলতে চাইছে, দেখ আমি হিম্মতওয়ালী।

তিন বাড়ি পড়িয়ে সংসার করা যায় না। ঘর ভাড়াতেই সব যাবে। একটা স্কুলে নীপার চাকরি প্রায় পাকা হয়ে এসেছিল। নিয়োগপত্র ছাড়ে ছাড়ে। বিয়ের আগে মা হবার অপরাধে সব ভেস্তে গেল। নীপাকে বললুম, 'ব্যাটাদের লেখ না, Delilah, and Judith, Aspasia and Lucretia, Pandora and Athena—Woman is at once Eve and the Virgin Mary. তখনই নীপা আমাকে ওই সুন্দর মন্তব্যটি করেছিল, আমাদের শিশু কখনও যীশু হবে না।

শেষপর্যন্ত কুড়ি টাকা ভাড়ায় ওই বস্তিতেই একটা টিনের ঘর ভাড়া করে দিল ওই ছেলেটি। সে যা জিনিস। দিনে গরমে প্রাণ যায়। রাতে মাতালদের বউ পেটানোর ঠেলায় পালাই পালাই ডাক ছাড়তে হয়। জীবনের কোনও না কোনও সময় মানুষকে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়। জীবনের অপর নাম সহ্য। জীবনের অপর নাম ধৈর্য।

আমার নতুন ঠিকানা জানিয়ে তনুর বাবাকে একটা চিঠি লিখলাম। চীনে হামলা তো শেষ হল। ভারত যতদূর অপদস্থ হবার তা তো হয়েইছে। আমার চাকরির কি হল। দিন সাতেক পরেই একটা অবাক করা চিঠি এল, তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তো ছেড়ে দিয়েছে। তার মানে সেই চিঠি পড়ে আছে আমার ছেড়ে আসা বাড়িতে। আমি নিজে কিছুতেই আর ও বাড়িতে যেতে পারব না। আমার চরিত্রের এ এক বড় বিশ্রী দিক। যা ছাড়ি, যাকে ছাড়ি তাকে আর ধরতে পারি না। আমার পা অবশ হয়ে আসে। আমার হাত শিথিল হয়ে যায়। আমার মন বেঁকে যায় পেরেকের মতো।

আমার আশ্রয়দাতা ছেলেটি সেই চিঠি এনে দিলে। এসে বললে, বড়বাবুর শরীর খুব খারাপ দেখে এলুম। তুমি একদিন গিয়ে দেখে এস। তিনি আমার কথা একবারও জিজ্ঞেস করেননি। কোথায় আছি। কেমন আছি। অভিমানের চেয়ে শক্ত কারাগার হয় না।

এখন ভাবি কি ভুলটাই না আমি করেছিলুম। অতীত তো আর সিলিং ফ্যান নয় যে পেড়ে এনে মেরামত করে আবার চালিয়ে দেব। তাঁত নয় যে আবার সুতো চাপিয়ে নতুন করে বুনতে বসব। আমার চাকরি তখন বেশ জমে উঠেছে। কলকাতায় পোস্টিং হয়েছে। সুন্দর অফিস, সুন্দর কোয়ার্টার। নীপার একটি সুন্দর ছেলে হয়েছে। বেশ রমরম, জমজম অবস্থা। একটা গাড়ি পেয়েছি। চাকরি, গাড়ি, বাড়ি, সুন্দরী স্ত্রী। মানুষ আর কি চায়। হাতের মুঠোয় ভাগ্যের স্টিয়ারিং। চলুক গাড়ি গড়গড়িয়ে। আমার যে বাড়ি ছিল, পিতা মাতা ছিলেন, আমার একটা অতীত ছিল, বর্তমানের নেশায় সব ভুলে বসে আছি।

হঠাৎ খবর এল, বাবা অসুস্থ। পড়ে আছেন হাসপাতালে। শেষের দিকে যা পেনসন পেতেন, তাতে তাঁর দিন চলত অতি কষ্টে। হাসপাতালের নাম শুনে ঘাবড়ে গেলুম। শহরের সবচেয়ে রদ্দি হাসপাতাল, যেখানে মানুষকে ফেলে রেখে আসা হয় মরার জন্যে। সুস্থ হয়ে ফিরে আসার জন্যে নয়। যে কেউ যে কোনও সময় যেতে পারে। কোনও ভিজিটিং আওয়ারস নেই। দুর্গন্ধ। নোংরা। ঈশ্বর আমার নিজের ভবিষ্যৎটা দেখাবেন বলেই ঠিক মৃত্যুর সময়েই আমাকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমার পরনে আমার ব্যঙ্গের মতো

দামী পোশাক। গলায় টাই। টাইপিন। ভোগে থেকে চেহারা আরও ফুলেছে। আর আমার সামনে ময়লা বিছানায় আমার বৃক্ষ। ডালপালা শুকনো। পত্রশূন্য। মাথার কাছে বসে আছেন তাঁর শেষ সময়ের বন্ধু। তিনিও বৃদ্ধ। বসে আছেন অসহায়। কিছু করার নেই। শেষটায় বাবার হাঁপানি হয়েছিল। হাই সুগার। বাত। সবরকম অসুখ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল।

দুই অভিমানী মুখোমুখি। তিনি কিছু চাননি, আমি কাছে এগোইনি। আমি সামনে দাঁড়াতে চোখ মেলে তাকালেন। অনেকক্ষণ দেখলেন আমাকে। যতই দেখছেন ততই তাঁর চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আমি হেঁকে বলেছিলুম, এ কি, শিগগিরি এঁকে নার্সিংহোমে ট্র্যানস্‌ফার করব। বাইরে আমার গাড়ি আছে।

পাশের অন্ধকার বিছানা থেকে কে একজন বললেন, এতদিনে মনে পড়ল বাবা।

আমার পিতা শীর্ণ হাতটি তুললেন। কাঁপছে থিরথির করে। অতি কষ্টে, ক্ষীণ গলায় বললেন, কিচ্ছু দরকার নেই বাবা। মানুষ যেখান থেকেই যাক, যাবে সেই একই জায়গায়।

আমার ভরাট উদ্ধত গলায় বললুম, না, তা হতেই পারে না। দিস্ ইজ নট ইওর প্লেস।

তখন আমার খুব গরম। ভাল রোজগার, যথেষ্ট সম্মান। হিল্লি দিল্লি করে বেড়াচ্ছি। তবু মনে হল এ কণ্ঠস্বর এই দৈন্যভরা হাসপাতালে বড় বেমানান। যেন গাড়ির টায়ারে হাওয়া ভরে ফোলাতে চাইছি।

তাঁর শীর্ণ হাতটি তোলাই রয়েছে। ফিস ফিস করে বললেন, কাছে এস। নাও ইজ দি টাইম। এইবার দড়ি খুলে যাবে। আর কোনও দিন দেখা হবে না। নেভার, বাই এনি চান্স, বাই নো চান্স। পিতা পুত্রে একবারই দেখা হয়। এসো কাছে এসো যাবার আগে দুজনে ভাব করে যাই। তোমার অনেক গুণ তবু রাম সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন। তুমি সুখী, তুমি সফল এই হোক আমার পালের বাতাস।

খুব থেমে থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন। দুজনে তাকিয়ে আছি দুজনের দিকে। তাঁর শীর্ণ হাত আমার মুঠোয়। দেখতে দেখতে তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। আমাকে উপেক্ষা করে চলে গেল বহুদূরে। অত কান্না জীবনে আর কোনও দিন আমি কাঁদিনি। মনে হয়েছিল কেন আমিও ওই নৌকোয় যাত্রী হতে পারছি না। আয়নাটা চিরকালের জন্যে ভেঙ্গে গেল

Eye to Eye

We saw the others
that we were
in the mirror that has quite forgotten us

মাথার কাছে বসে থাকা বৃদ্ধ বললেন, যাঃ হয়ে গেল। বলে ফোঁ করে এক টিপ নস্যি নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কে একজন ছুটে এসে বললেন, খালি হয়েছে। খালি হয়েছে। ওই বাথরুমের দরজার কাছে যে পড়ে আছে তাকে এখানে ট্র্যানসফার করো।

এর নাম চলে যাওয়া। খেলোয়াড় আজ মাঠ ছেড়ে চলে গেলে আবার কাল ফিরে আসে। আবার কালের কালে আসে। এ এমন এক খেলা, বল রইল, মাঠ রইল, খেলোয়াড় আর ফিরবে না। বাঁশি বাজবে। লাইনসম্যান ফ্ল্যাগ নাড়বে। নতুন প্লেয়ারের পায়ে পায়ে বল ঘুরবে। গোল হবে। গ্যালারিতে চিৎকার করবে দর্শক। পুরনো খেলোয়াড়কে দর্শকের আসনেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেউ এসে জিজ্ঞেসও করতে পারবে না, বলুন কেমন খেলছে, আপনার কোন নির্দেশ আছে ? ঘাস আছে। আছে পায়ের স্পর্শের স্মৃতি। বাকি শূন্যতা। মৃত্যু বড় মজার জিনিস। কে ছিল ? কি ছিল ? কে গেল ? কি গেল ? এ এক মহা অঙ্ক। বহুভাবে চেষ্টা হল। কোনও উত্তর নেই। কে তুমি ? আমি। আরে [illegible] আমিটা কে ?

ঠেসে একটা চড় মারলে মানুষের যেমন হয়, পিতার মৃত্যু আমার সেই অনুভূতি। মনের গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেল। কামকীট। অর্থলোভী। ব্যক্তিত্বশূন্য একটা মানুষ। পাঁচ ফুট ন ইঞ্চি মাপের একটা দেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকি। মুখ ঘষি, মাথা ঘষি। হাত দিয়ে খামচাই। প্রতিদিন আমি দীন হই। প্রতিদিন আমার একটু করে মৃত্যু হয়। মানুষ চাঁদে যায়। আমি স্ত্রীতে যাই। উপগ্রহ ছোটে মঙ্গলগ্রহের খোঁজে। আমি ছুটি স্ত্রীর দেহে। বিজ্ঞানী সারা রাত আবিষ্কারের আনন্দে মশগুল। আমি মশগুল নারী দেহে !

তুমি কে ? আমি ? আমি সে। যে মরে গেলে বল হরি বলে পুড়িয়ে আসে। কি লেখা হবে তার সম্পর্কে। দুটি লাইন লেখা যেতে পারে, বিছানায় জন্মেছিল, বিছানা ভিজিয়েছিল, বিছানায় গড়িয়ে ছিল, বিছানায় বংশবৃদ্ধি করেছিল। আবার বিছানা ভিজিয়েছিল, বিছানা সমেত হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তার নাম ঈশ্বর বিছানাচন্দ্র।

তিনি পৃথিবীকে কি দিয়ে গেছেন। দিয়ে গেছেন ঘোড়ার ডিম। যে অফিসে কাজ করতেন সে অফিসে দিস্তে দিস্তে চোথা কাগজ রেখে গেছেন, হিজিবিজি লেখা, আরশোলার ডিমপাড়ার জন্যে। রেখে গেছেন অসংখ্য স্তাবক আর

নিন্দুক। রেখে গেছেন গোটা দুই অপোগণ্ড। শূন্যে খান তিনেক ঘরঅলা বকবকম খাঁচা। এই হল তাঁর কন্ট্রিবিউশান। আর নিয়ে গেছেন ! টন টন চাল, গম, আলু, পটল, ভেণ্ডি, কলাটা, মুলোটা। ডজন ডজন মুরগী, পাঁঠা, শয়ে শয়ে ডিম। গ্যালন গ্যালন জল। ডেঁড়েমুশে ফাঁক করে দিয়ে জ্ঞান আর উপদেশের বন্যা বইয়ে তিনি ঈশ্বর হয়ে গেছেন।

মানে মানুষের কতো ন্যাকামো আর ধাস্টামো থাকে। সৎকার হয়ে যাবার পর দিন তিনেক এমন একটা ভাব করে রইলুম, যেন এখুনি সব ছেড়েছুড়ে গৃহত্যাগ করব। অতীতের এক একটা কথা মনে পড়ছে আর ক্ষণে ক্ষণে চোখে জল এসে যাচ্ছে। আর তখনই আনন্দে বুক ভরে উঠছে। কিসের আনন্দ। কে বলে আমি হৃদয়হীন, স্বার্থপর, কর্তব্যবিমুখ কুলাঙ্গার। এই তো শোকে আমি আকুলি বিকুলি করে উঠছি। এই তো আমি দরবিগলিত। পর মুহূর্তেই কোরা শাড়ি পরে সামনে ঝুঁকে নীপা কি একটা নিচ্ছে হয়তো, তার নিটোল নিতম্ব দেখে মনে হচ্ছে বাঃ অভ্যস্থ আবরণে এতদিনে যা দেখেছি, এ যে তার চেয়ে অন্যরকম। আলাদা আকর্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে মন বেদনায় ভরে উঠেছে, ছিঃ ছিঃ মৃত্যুর চেয়ে যুবতীর নিতম্ব বড় হল। কাঁদো কাঁদো। জোর করে কোঁত পেড়ে পেড়ে কাঁদো। উত্তর পুরুষের সঙ্গে পূর্বপুরুষের অশ্রুনদীর যোগ না থাকলে সংসার তো আঁতুড়ঘর ছাড়া আর কিছুই ভাবা যাবে না। সব ভালো ভালো জ্ঞানের কথা তো হয়ে যাবে উপহাসের মতো।

খুব ঘটা করে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করলুম। বিশাল একটা ছবি ঝোলালুম দেয়ালে। যা নয় জোর করে তা প্রমাণ করার জন্যে। মিথ্যাকে সত্য করার জন্যে। আমরা পরস্পর একটা শিকলে বাঁধা আছি এই বিশ্বাসটাকে বদ্ধমূল করার জন্যে। আমি যেই চলে যাব সব মুছে যাবে এই আতঙ্কটা কাটাবার জন্যে।

নিয়মভঙ্গের দিন রাতেই নীপাকে জাপটে ধরলুম। হাত দিয়ে কনুই মেরে ঠেলে সরাতে সরাতে নীপা বললে, 'তুমি কি অমানুষ ? কিছুদিন আমাকে ছেড়ে স্মৃতি নিয়ে থাকো না।'

এত বড় শয়তান আমি, হাঁসফাঁস করতে করতে আমি কি বলেছিলুম এখনও আমার মনে আছে, 'জানো আমি স্বপ্ন দেখেছি, বাবা, আমাদের সন্তান হয়ে আসতে চাইছেন।' নীপা আধো অন্ধকারে নগ্ন হতে হতে খিলখিল করে হেসেছিল, 'তোমাকে আমি চিনি।'

আমাকে নিয়ে নীপার পাগলামি ক্রমশ কমছিল। কাছাকাছি এসে নীপারও অনেক ত্রুটি আমার চোখে পড়ছিল। দেহ হিসেবে তুলনাহীন। মন আর স্বভাবে অনেক মেরামতের প্রয়োজন ছিল। অগোছালো, রাগী, উদাসীন, বারমুখো,

বেহিসেবী। অন্যের কাছে চট করে ধরা দেয়। আর সেই ধরা দেওয়াটা অনেক দূর এগোতে পারে।

মাঝে মাঝে সন্দেহ হত, ছেলে আর মেয়ে দুটো আমার তো।

প্রেম, বিবাহ, সংসার সবই নেশা। বোতলের নেশায় একরাত বুঁদ, প্রেমের নেশায় বড়জোর এক কি দুবছর। নেশার ঘোরে এটা ওটা সেটা ক্ষমা করা যায়, তারপর আর যায় না। মানুষ কাজ চায়, বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ দেখতে চায়। নিষ্ঠা সততা আর সমর্পণ চায়। সংসার তো আর পাঁচতারা হোটেলে তে-রাত্তির বাস নয়। সবই সাজান আছে, খাও দাও ঘুরে বেড়াও। স্ত্রী তো আর বেশ্যা নয় যে বিছানা ছাড়ার পরই তাকে ভুলে যাও। স্ত্রী যে মানুষের গর্ব। ওল্ড টেস্টামেন্টে পড়েছি না,

A good wife is a crown to her husband
But one who acts shamefully is like not is his bones.

নীপাকে একদিন খুব আদর করে বললুম, ঈশ্বর তো আমাদের দিলেন অনেক কিছু, সংসারটাকে একটু সুন্দর করে গোছাও না। এই তো ঘোষ, বোস, মিত্তিরদের বাড়ি যাই, কি সুন্দর সাজানো গোছানো টিপটপ। আর আমাদের। তারে তোমার শাড়ি ঝুলে আছে তো আছেই যেন বেওয়ারিশ লাশ, পুলিস এসে না নামালে সরবে না। খাটের ছত্রিতে তোমার ব্লাউজ ব্রা। চেয়ারে তালগোল শায়া, ময়লা তোয়ালে। কোনওদিন দেখলাম না খাটে নিপাট নিভাঁজ বিছানা। তোমার কোথাও কোনো হিসেব নেই। এ যেন বেদের টোল।

নীপার স্পষ্ট উত্তর আমার বাপ বেদে, আমার মা বেদে, আমিও বেদে।

আমি ডেকে দেখালুম, এই দ্যাখ ওলড টেস্টামেন্ট,

Like a golden ring in the snout of a sow
Is a beautiful woman lacking in taste.

তোমার সব আছে, নেই টেস্ট। তোমার বড় বোনের সংসারে গিয়ে দেখ তো। এমন কিছু বড়লোক নয়, অথচ কি সুন্দর। নীপা বললে তাকে বিয়ে করলেই পারতে। বুঝতে ঠেলা। পাঁজীপুঁথি দেখে মাসে একবার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারতে। আমার মতো এমন রোজ রোজ তোমার আগুনের কাঠ হত না, লাথি মেরে ফেলে দিত।

নীপা প্রায়ই আমার এই পুরুষালী দুর্বলতায় খোঁচা মারত। 'তুমি কি আমাকে দয়া করো?'

'অনেকটা তাই। আমি বছর বছর মা হয়ে আমার ফিগার নষ্ট করতে পারব

না। আমার একটা ফিউচার আছে।'

'তোমার ফিউচার। তোমার আবার ফিউচার।'

'কেন তোমার শূকরী হবার জন্যেই জন্মেছি নাকি! আমাকে তোমার বন্ধু গোয়েল বলেছে, যার এমন ফিগার সে অনেক কিছু করতে পারে।'

'তা পারে মাতাল গোয়েলের সঙ্গে শুতে পারে।'

'তার চরিত্র তোমার চেয়ে ঢের ভাল। অফিসের আধবুড়ী স্টেনোকে শেষ বেলায় ডেকে দরজা বন্ধ করে ডিকটেশান দেয় না।'

'তুমি নোঙরা।'

'আর তুমি পরিষ্কার দেবালয়। ছাত্রীর হাত ধরে টান। বিয়ের আগে মা করে দাও।'

'তুমি এসেছিলে।'

'আমি তোমাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলুম।'

'পায়ে নয় মাথায়।'

'আশীর্বাদ করেছিলে মাথায় নয়, ব্লাউজ ছিঁড়ে বুকে, তলপেটে।'

'তুমি ইতর।'

'তুমি আতর। যে গায়ে লেগে যাবে দুর্গন্ধে তিষ্ঠনো যাবে না।'

'তুমি নারসিসিস্ট নিজের দেহ ছাড়া কিছু ভালবাস না।'

'তুমি রেপিস্ট। তোমার চোখে মা মেয়ে সব সমান।'

'তার মানে?'

'মানে তোমার চোখে। তুমি যে চোখে আমার দিকে তাকাতে ঠিক সেই চোখেই তাকাতে মায়ের দিকে।'

'ছিঃ, ছিঃ নীপা।'

'ছিঃ আমি নই ছিঃ তুমি। তুমি যখন বস্তীতে ওই চরিত্রহীনটার বাড়িতে থাকতে, তখন তুমি ওই মেয়েছেলেটাকে মনে মনে কামনা করতে।'

'তুমি অন্তর্যামী।'

'গত ছমাসে তুমি তিন দিন বেশ্যালয়ে গেছ, অস্বীকার করতে পারো?'

'কে বলেছে, গোয়েল?'

'যেই বলুক।'

'গোয়েল আমাকে জোর করে নিয়ে গেছে।'

'গোয়েল ব্যাচেলার সে যেতে পারে, তুমি গেলে কেন। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। তোমাকে যে খারাপ কোনও রোগে ধরেনি তার কি প্রমাণ। তোমার দিল্লিতে এক প্রেমিকা আছে তার নাম অমৃতা।'

'কে বলেছে ?'

'বলেছে চিঠি। তোমার চিঠি খুলে আমি পড়েছি। আবার জুড়ে রেখে দিয়েছি। কে এই অমৃতা। কেন সে তোমাকে অত সাহসী চিঠি লেখে। কেন অফিসের কাজের নাম করে তুমি ঘনঘন দিল্লি যাও। আমি তোমার ঘরের মুরগী তাই তো। তুমি এত বড় অমানুষ, অশৌচ অবস্থায় যখন মালসা পুড়িয়ে আমাদের একাহার কম্বলে ভূমিশয্যা, তখনও তুমি করার চেষ্টা করেছ। তোমার কাছে সম্পর্কের সামান্য লোক দেখানো মূল্যও নেই। তুমি ভোগী, তুমি কামুক।'

নীপার জ্বালা ধরানো কথায় নিজের দিকে তাকাবার অভ্যাস ক্রমেই বাড়তে লাগল। মুখের ওপর যে সত্য কথা বলে সে অপ্রিয়। সব মানুষই অভিমানী, আমার অভিমান কিছু বেশি। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। কেউই কারুর কাছে পুরোপুরি ধরা দিতে চায় না। সবসময় একটা ব্যবধান রাখতে চায়। আমার আর নীপার দূরত্ব বেড়েই চলল। রাতে পাশাপাশি শুয়ে থাকি। ভয়ে অভিমানে গায়ে হাত দিতে পারি না। ভেতরটা ছটফট করে। কখনও মনে হয় পায়ে ধরি। বলি আমি পারছি না। আমি পারব না। পরমুহূর্তেই মনে হয়, আমি না পুরুষ। আমি হেরে যাব! আমার সন্দেহ বাড়তে থাকে। নীপাকে আমিই দুঃসাহসী করেছি। প্রথম পাপ সে আমার সঙ্গেই করেছে। অনেকটা নিচে নেমে এসে আমি নিজেকেই ছোট করেছি। তিন বছরে আমি তার চোখে যতটা উঠেছিলুম, আধঘণ্টায় ঠিক ততটাই নেমে গিয়েছিলুম। নীপা পতিতা নয়, আমি পতিত। দুজনের বিয়ে দুটো সইয়ের চুক্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। একসঙ্গে বসবাসের আইন মোতাবেক ছাড়পত্র। নীপা আমার দুর্বলতা জেনে গেছে। জেনে গেছে এ হল সেই বেড়াল যে মাছের জন্যে সবসময় ছোঁক ছোঁক করবেই। সব মেয়েই কম বেশি নিষ্ঠুর। নীপা একটু বেশি। নীপাদের বাড়িতে মেলামেশার কোনও শাসন ছিল না। তার বাবা মা জীবধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম মানে না। নীপার বাবার কাছে নীপার মা ছিল ক্যাশ কাউন্টার। এই আমার চেক দাও তোমার টাকা। নীপার বাবা বুঝে গিয়েছিলেন তাঁর মেয়েরা হল পরিবারের নয় সামাজিক দায়িত্ব। সেই পরিবারের মেয়ের কাছে আমার প্রত্যাশা গৃহবধূর। সেই আশা আবার শয়তানের স্বার্থমাখা। সকালে গৃহবধূ আদর্শমাতা, মধ্যরাতে নির্লজ্জ গণিকা। আমি শুধু শয়তান নই, আমি একটা গাধা।

কামু লিখেছিলেন আধুনিক মানুষের জীবন কেমন জানো। খাটে শুয়ে থাকবে বউ আর স্বামী মেঝেতে শুয়ে তার কথা চিন্তা করতে করতে মাস্টারবেট করবে। নিজের জীবনই তার প্রমাণ। নীপা এখন প্রেমিক খুঁজছে। খুঁজতেই পারে। প্রেমে তো দায়িত্ব নেই। নীপা আমাকে ছাড়তে পারে আমি পারি না। নীপা

আমার মোহ, আমার সম্পত্তি, আমি নীপাতে অভ্যস্থ। সেরকম হলে খুন করব। আমার অ্যাকাউন্টে ফুর্তি করা চলবে না।

ক্রমশ আমি নিষ্ঠুর হতে শুরু করলুম। তার অজস্র খুঁত ধরতে লাগলুম। তুমি গোছাতে পার না, রাঁধতে পার না, এমন কি ছেলেটাকেও সামলাতে পার না। তোমার রান্নাঘর ভাগাড়। আমাদের বাথরুম করপোরেশানকেও হার মানায়। এইরকম যখন চলছে তখন একদিন নীপা বাইরে কোথা থেকে ছুটে এসে আমাকে বললে স্কাউন্ড্রেল। আমি অবাক হয়ে তার সুন্দর মুখের দিকে তাকালুম। রূপ যেন ফেটে পড়ছে। নীপা অসভ্যের মতো তার পেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'আবার আসছে।' নীপার অঙ্গভঙ্গী আর বলার ধরনটা এত অশ্লীল। আমি বলেছিলুম, 'আসছে তা আসুক না। অবৈধ কিছু তো নয়। আমরা তো চেয়েইছিলুম।'

'আমরা বোলো না। ওর মধ্যে আমি নেই। প্রথমটার তিন পেরোতে না পেরোতেই আর একটা।'

নীপা প্রথমটার উল্লেখ এমনভাবে করল যেন ওটা তার সন্তান নয়। নীপা মা নয়। একটা অবাঞ্ছিত কিছু। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম। ভীষণ সেজেছিল সেদিন। সন্দেহ হয়েছিল এত সাজ কার জন্যে। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, 'তোমাকে আজ ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।'

নীপা সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, 'তবে আর কি সব খুলে ফেল।'

আমি রাগি, তবে সে রাগে আমি সাধারণত নিজেই ভেতরে ভেতরে পুড়তে থাকি। সেদিন কি হল জানি না, ঠাস করে নীপার গালে একটা চড় কষিয়ে দিলুম। আমাকে ছাড়াই আমার হাত যেন নিজে নিজে কাজ করল। সম্পূর্ণ স্বাধীন। নীপা হকচকিয়ে গেল। নীপা যে কতটা রাগতে পারে সেদিন দেখেছিলুম। ঠিক দশটা মিনিটের মধ্যে সংসার লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। ভেঙে চুরে ছিঁড়েখুঁড়ে সব তছনছ করে দিল। সে যখন নিতান্ত ছোটলোকের মতো এইসব করছে, শাড়ির একটা দিক খুলে পড়েছে, উত্তেজিত নিঃশ্বাসে বুক ওঠা নামা করছে, খোঁপা খুলে গেছে তখনও আমি ভাবছি নীপা কি সুন্দরী। একটা খালি দুধের টিন আমাকে ছুঁড়ে মেরেছিল। কপালের একটা পাশে লেগে কেটে গেছে। জ্বলছে সেই জায়গাটা। তবু তার সেই বন্য, আদিম রূপের অন্য একটা মাদকতা ছিল। ঘরের বউকে পরের বউ ভাবতে বেশ লাগে। আমার মনে হয়েছিল নীপার মধ্যে আমি একই সঙ্গে চারটে মেয়েকে দেখছি। সেই বস্তীর মুখরা মাঝবয়সী ঝানু মেয়েছেলেটি যে রবিবার মুখে পাউডার মেখে লাল আঁটোসাঁটো

ব্লাউজ পরে টান করে শাড়ি পরে ছেলের বয়সী স্বামীটাকে টানতে টানতে সিনেমায় যেত। দেখতে পাচ্ছি সেই পাড়ার মেয়েটাকে গোয়েলের পাল্লায় পড়ে যার কাছে আমি তিনবার না চারবার গিয়েছিলুম। মদে চুর হয়ে সে গেলাস ছুঁড়ত, অশ্লীল কথা বলত, তারপর গোয়েল তাকে চেপে ধরত। তখন মনেই হত না গোয়েল একটা উচ্চ শিক্ষিত ফার্স্টক্লাস পাওয়া ছেলে। মেয়েটা লাথি ছুঁড়ত আর অকথ্য গালাগালি দিত। আমাকে বলত তুইও আয় শালা, বসে কেন ? শোনা মাত্রই আমার ভেতরের মৌচাকে খোঁচা লাগত। আনন্দের অসংখ্য মৌমাছি পিনপিন করে বেরিয়ে আসত। যত পড়েছি যত সহবত শিখেছি, শিখিয়েছি, সব ভেসে যেত, মনে হত সব বাজে, ওপরের ঠাট, সমাজে চলার, নিজেকে চালাবার মুখোশ। বেদের ঋষি থেকে মর্ডান ধর্মগুরু আলো আলো জ্যোতি জ্যোতি বলে চেঁচালে কি হবে, মানুষ অন্ধকারেই ডুবতে চায়, আলোক সাগরে নয়। ওটা মানুষের কাছ থেকে বাড়তি সম্মান আদায়ের শস্তা ফিকির। যা আমরা সবচেয়ে ভালবাসি তাকেই আমরা সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি। ভালবাসার জিনিসকে সহজে ছাড়া যায় ঘৃণার জিনিসকে ছাড়লেও মনে একটা স্থায়ী দাগ রেখে যায়। অসুখের কথা বেশি মনে থাকে, আরোগ্যের কথা ভুলে যায়। মাধ্যাকর্ষণে সব নামছে নিচের দিকে। ওপরে ওঠতে গেলে যে শক্তি চাই তার মূল্য বিলিয়ান বিলিয়ান ডলার। আকর্ষণের বাইরে মহাজগত শূন্য, অনিশ্চয়তায় ভরা উদ্দেশ্যহীন, ভীতিপ্রদ। মানুষ বলে মন ঊর্ধ্বগামী হও aspires to the sky, to the light, to the sunny summits, to the pure and crystalline frigidity of the blue sky কিন্তু তার পা দুটো কোথায় moist, worm and darkling gulf ready to draw him down. সমস্ত কিছুর সমাপ্তি নারীর অন্ধকার গর্ভে। সেইখানেই তো ছিলাম হেঁটমুণ্ড, ঊর্ধ্বপদ। আলো ছিল না, ছিল জৈব-তরঙ্গ। মৃত্যু আবার তো সেই গর্ভান্ধকারে মহাপ্রয়াণ back into the maternal shadows cave, abyss, hell ! চসারের সেই বৃদ্ধ মানুষটি যে মৃত্যু চায় অথচ মরতে পারছে না, তার একমাত্র প্রার্থনা

With my staff, night and day
I strike on the ground, my mother's doorway,
And I say : Ah mother dear, let me in.

মুক্তি ! সে তো বন্ধন। আমার পিতা কোথায় আমাকে প্রোথিত করেছিলেন। আলোর পদ্মে না অন্ধকার যোনি। আমার পুত্র। Woman Mother has a face of shadows. তিনি কালী। Woman is the more tenebrarum, it is the night in the entrails of the earth.

কোমর থেকে নীপার শাড়ি খুলে পড়ে গেছে। শায়া। লাল শায়া লাল খাটো ব্লাউজ। ব্রেসিয়ারের সাদা স্পষ্ট। লম্বা লম্বা মৃণালভুজের মত হাত। ঘরের একপাশ থেকে আর একপাশে নেচে নেচে চলেছে। মনে হচ্ছে খুব কস্টলি বাঈজী। সামনে ঝুঁকে পড়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটাকে টেনে হিঁচড়ে খোলার চেষ্টা করছে। নীপার পেছন দিকটা আমার অফিসের স্বামী পরিত্যক্তা সেই স্টেনো মহিলার মতো যে এর আগে অনেক অফিসারকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে। আমাকে যে ধরেছে এবার। মহিলা পুরোপুরি পারভার্ট। নীপার ওপর দিকটা পেছন থেকে দেখছি। মনে হচ্ছে অমৃতা। সামনে ঝুঁকে পায়ে ক্রিম মাখছে। অমৃতা যেমন মাখত মুসৌরীর হোটেলে। চারজন মহিলা নীপা হয়ে আমার সামনে নৃত্য করছে। এক সময় সত্যিই সে ভাল নাচত, নাচাতো বোঝা যায়।

নীপার কাণ্ড দেখে প্রথমে আমার রাগ হচ্ছিল। ভেঙে চুরে কত টাকার যে ক্ষতি করলে। আমার কপাল কেটে রক্ত বেরোচ্ছে। কিন্তু তার এই রণরঙ্গিণী মূর্তির যে কি মোহ। তাই তো শিব শব হয়ে বুক পেতে দিয়েছিলেন। নীপা ঘেমে গেছে। কোমরের শুভ্র নিটোল অংশ ঘামে মোমের মত নরম চকচকে। মনে হচ্ছে এখুনি গলে পড়বে। সেই কবিতার লাইনটা মনে পড়ে গেল,

A candle is burning
on the table top
flickering flames, shadowsdance
life melts drip by drip
in the hollows of the earth.

ভীষণ ভালবাসতে ইচ্ছে করছে নীপাকে। সুস্থ সময়ে এমন বাঈজীর বেশে সে আমার সামনে নাচত কি! ওই যে সামনে ঝুঁকে আছে, শরীরের সুডৌল, সুছন্দ পশ্চাদ্দেশ দুলছে, মনে হচ্ছে নাচের ফাঁকে পায়ের ঘুঙুর ঠিক করে বেঁধে নিচ্ছে, ড্রেসিং টেবিলের আয়না মুচড়ে খুলে আনার চেষ্টা করছে না, এই দৃশ্যের দামই তো পাঁচ হাজার মুদ্রা। না হয় এ হল তাণ্ডব-নৃত্য!

আমি চট করে উঠে গিয়ে পেছন দিক থেকে নীপার কোমর জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টেনে নিলুম। নীপা পেছন দিকে হাতের ঝটকা মেরে, আমার বন্ধন থেকে সরে যাবার চেষ্টা করল। তার হাতের রুলি লেগে আমার ডান গালের একটা অংশ চিরে গেল। আর সেই মুহূর্তে বড় আয়নাটা আমাদের পায়ের কাছে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। মেঝের ওপর ছড়িয়ে আছে নীপার অসংখ্য মুখ। টুকরো টুকরো আয়নায় তার টুকরো মুখ। এক হঠাৎ বহু হয়ে গেল। আমার চোখের সামনে সৃষ্টিতত্ত্বের সেই বৈদিক রহস্য। একই বহু, বহুই এক। আমার চৈতন্য তখন সাংঘাতিক কাজ করছে। মনে হল বহু শব্দ থেকেই বউ

এসেছে। একোহহং বহু স্যাম।

টুকরো টুকরো আয়নায় আমাদের দুজনের টুকরো টুকরো প্রতিবিম্ব। কোনওটায় চিবুক থেকে নিম্নাংশ। কোনওটায় ঊর্ধ্বাংশ। কোনওটায় নীপার লাল অন্তর্বাসে ঢাকা নিম্নাংশ। কোনওটায় একটি মাত্র লাল কাশ্মীরী আপেল। এমন অসাধারণ দৃশ্য একমাত্র কুরুক্ষেত্রেই দেখা যায়। অর্জুনের ভাগ্যে যা ঘটেছিল। ক্যালকুলেশন করে হয় না।

ঝনঝন করে অতবড় একটা আয়না ভাঙার শব্দে নীপা থমকে পড়েছিল। কাঁচ ভাঙার শব্দের একটা নেশা আছে। এতক্ষণ আয়নাটা ছিল সামনে। তাইতে ভাসছিলাম আমরা। হঠাৎ সেটা অদৃশ্য। আমরাও অদৃশ্য। শূন্য দেয়াল। কম্পমান ঊর্ণনাভ। যা কিছু আমরা চোখে দেখি, তা যে কত ক্ষণভঙ্গুর আর অনিত্য, এই মহাসত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, নীপা স্তম্ভিত। আমারও সেই একই অবস্থা। নীপার কানে ইয়ারিং দুলছে। খোঁপা ভাঙা চুল পিঠে আলুলায়িত। ঘামে ভেজা পিচ্ছিল মোম শরীর আমার দেহের বন্ধনে। আমি তার কানের কাছে ফিসফিস করে বললুম, "সর্ব্বাত্মনা দৃশ্যমিদং মৃষৈব, নৈবাহমর্থঃ ক্ষণিকত্বদর্শনাৎ"। আর এই যে দেহাভিমানের আপদ দেহ মাংস পিণ্ড, এই মাংসপিণ্ডের অভিমান ত্যাগ কর। অতোহভিমানং ত্যজ মাংসপিণ্ডে, পিণ্ডাভিমানিন্যপি বুদ্ধিকলিপতে। তুমি মাংসপিণ্ড নও। তুমি মনে করো একটা আপেল গাছ। তাতে দুটি ফল পেকেছে। মনে করো সেই ফলন্ত ডালটিকে স্থাপন করা হয়েছে ঘটনিতম্বে।

রাগ হল কালবৈশাখী। নিমেষে সব ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। প্রকৃতি যেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ে, মানুষও তেমনি নিস্তেজ হয়ে যায়। আমার শরীরে নীপা ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে পড়ল। নীপা নিবল আর আমি জ্বলে উঠলুম। বারুদ আর আগুন জ্বলবে এই তো বিধাতার নিয়ম। সেই নিয়মের বাইরে যাওয়া মানেই বিদ্রোহ করা। যা যা মানুষের ভাল লাগে তা তো ভাল লাগার জন্যেই করা হয়েছে। শুধু মাত্র অন্তর্বাস পরে মেয়েরা পুরুষের সামনে এলে মনে যাতে একটা ব্যাপার হয়, সেই ভাবেই মন তৈরি। আমি তো আর একটা মন এনে, এ মনটাকে ফেলে দিতে পারিনা। আমি কি দিন দুনিয়ার মালিক!

নীপা আমার। নীপার জন্যে আমি ঘর ছেড়েছি। এই ঘামে ভেজা পিচ্ছিল সুদীর্ঘ শরীরের অধিকারী আমি। ভাঙ্গা কাঁচ, টুকরো আয়না ছত্রাকার সব জিনিসপত্রে বিপজ্জনক শয্যায় নীপা আর আমি। কথায় বলে, গোলাপ তুলতে হলে কাঁটার খোঁচা খেতেই হয়। হিসেবী, বেহিসেবী, সংযমী, অসংযমী, সকলেই শেষটা এক। কাঁপতে কাঁপতে, ধুঁকতে ধুঁকতে, ব্যা ব্যা করতে করতে

বলির পাঁঠার মতো হাঁড়িকাঠে মাথাটি গলিয়ে দেবে। তার চেয়ে এই ভালো।

The sad are slaughtered/ The world grows merry.

দুঃখকে হত্যা করতে পারলেই জগৎ আনন্দের। মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা নীপা বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকাল। প্রতিবাদের শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। নীরব প্রশ্ন, কি হচ্ছে! এ কথা সবাই জানে পৃথিবীর কোনও কিছুই নিঃস্বার্থ নয়। সাগর মেঘকে জলকণা ধার দেয় বলেই মেঘ বৃষ্টি হতে পারে। গাছের শিকড় মাটিকে ধরে রাখবে বলেই মাটি গাছকে ধরে। মা সন্তান দেন বলেই তিনি সন্তানের মা। নীপা তাকালে কি হবে, নীপা জানে না, আগুন জ্বালালে পুড়তেই হবে। তুমি পড় নি সেই কবিতা—

all own everything
all exploit all
all oppress all
all are exploited by all
all are oppressed by all
all gain everything
all lose everything
all are everyone's masters
all are everyone's slaves
all are everyone's superiors
all are everyone's subordinates
all owe everyone everything
all do anything to everyone.

তুমি তো জান সারা দুনিয়া এই নিয়মেই চলছে। একই কারখানা, একই উৎপাদন। মানুষ। সফল মানুষ, ব্যর্থ মানুষ। সুখী মানুষ, অসুখী মানুষ। প্রেমিক মানুষ, দস্যু মানুষ।

সব শেষে নীপা বললে, 'এটাকে আমি সরাতে চাই।'

'অসম্ভব। দ্যাটস এ ক্রাইম। অপরাধ, খুন। আমরা প্রেমিক পিতামাতা। প্রেম হল ফুল। সন্তান হল ফল। আমাদের অভাব কি! আমি ডান হাতে বা হাতে রোজগার করছি। কে বলতে পারে কে আছে ওখানে। বহুদিন হয়ে গেল আর একজন শ্রীচৈতন্য আসার সময় হয়েছে। বুদ্ধও আসতে পারেন। আসতে পারেন মহাবীর। শেকসপীয়র এলেই বা ক্ষতি কি! এই ভাবেই তো তাঁরা আসেন। আসার দরজা, যাবার পথ কোনওটাই পাল্টায়নি।'

নীপা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তার সারা শরীর ফসফরাসের মতো জ্বলছে।

নীপা এখন আমার হাতের মুঠোয়। যাবে কোথায়! সব শরীরই তো রক্তমাংসের। যোগ আর ভোগ কোনওটাই কি শরীর বাদ দিয়ে হয়। শরীরম আদ্যম। আর সত্যিই কি নীপার যোগিনী হবার বয়েস হয়েছে। ও বারে বারে মা হতে চায় না। চিরটাকালই নায়িকা থাকতে চায়। তা কি সম্ভব। নায়িকারও তো নায়ক থাকবে, তা না হলে নায়িকা বলবে কে! দর্পণ আছে বলেই তো বিম্ব আছে। এই যে নীপা এখন সব ভেঙেচুরে, রক্তাম্বরা ভুজঙ্গিনীর মতো ধরাতলশায়ী, এই দেহকেই তো পুরাণ ব্রহ্মাণ্ড বলছেন। বলছেন, মনুষ্য দেহভাণ্ড যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্তসার। নীপাকে তন্ত্রটা পড়াতে হবে, যেখানে লেখা আছে—

ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।
পাতালং ভূধরা লোকা আদিত্যাদি নব গ্রহাঃ ॥
নাগাশ্চ সর্বদেহিনাং পিণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ।
পদাধস্তলং বিদ্যাত্তদূর্দ্ধং বিতলং তথা ॥

এই দেহতেই কৈলাস, এই দেহতেই হিমালয়, এই দেহতেই শ্রীবৃন্দাবন, এই দেহতেই গোবর্দ্ধন, এই দেহের ভেতরেই হরগৌরীর লীলা, কৃষ্ণরাধিকার লীলা। এই দেহই গুপ্ত বৃন্দাবন, উমার একাম্রকানন। আকর্ষণ আর বিকর্ষণ তন্ত্র এই শক্তিকেই তো বলেছেন সর্প বা ভুজঙ্গম। এই শক্তিসমবায়ে বিশ্বসৃষ্টির বিন্যাস এবং বিকাশ। যখন শক্তির খেলা হয়, বিকাশ হয়, বিশ্বসৃষ্টি ফুটে ওঠে। আর বিশ্বই হল দেহ। ওই যে বলছেন মনুষ্যদেহভাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্তসার। তন্ত্র বলছেন সৃষ্টির সময় সাপের খেলা হয়। সাপের সার হল বিষ। সেই বিষ লিঙ্গেশ্বর ধারণ করলেন কোথায় না কণ্ঠে! উদরে নয় কেন? যদি হজম হয়ে যায়! সৃষ্টির মূলই তো সর্পবিষ। হজম হয়ে গেলে সৃষ্টি হবে কি করে! বিষাক্ত, নীলাভ লীলায় কুণ্ডলিনীর জাগরণ। তন্ত্রের সেই জায়গাটা নীপাকে পড়াতে হবে যেখানে পরিষ্কার অনুবাদে লেখা আছে—কুণ্ডলিনী না জাগিলে কোন স্ত্রীই গর্ভবতী হইতে পারে না, কুণ্ডলিনী না জাগিলে কোন পুরুষের রেত-প্রবাহের সহিত আত্মশক্তির নিঃসরণ হয় না, নারীর জরায়ুতে নবজীবের আধান হয় না।

আমি তো শুধু স্বামী নই। শিক্ষক থেকে স্বামী হয়েছি। 'জীবন আমার বিফলে গেল, লাগিল না কোনও কাজে' বলে ছাত্রীকে আমার কাঁদতে দোব না। তাকে বই খুলে দেখাব এই দেখ স্পষ্ট লেখা 'নারীর নিন্দা হইতেই আমরা মৈথুন কার্যের নিন্দা করিতে শিখিয়াছি। যে কার্যের ফলে জীবসৃষ্টি হইবে, প্রজা বৃদ্ধি হইবে, তাহার নিন্দা করিতে নাই।' আর আমার আচরণই প্রমাণ করছে আমি কত বড় বৈষ্ণব, মেরেছ টিনের কোণা, তা বলে কি প্রেম দেব না। আমি পুরুষ

নই গুপ্ত মহাপুরুষ, গুপ্ত যোগী, শুধু চিনতে পারলে না বলে, ভোগী আর লম্পটের অপবাদে লাথি মারলে।

অপকর্মকারী শাস্ত্রকে কি ভাবে দুমড়ে মুচড়ে নিজের অপকর্মের সমর্থনে লাগায়। এরই নাম মানুষের আদালত। অনন্ত সওয়াল-জবাবে কেউ দোষী, কেউ নির্দোষ। সৃষ্টির মূলে সত্যিই বিষ। তা না হলে ছেলে আর মেয়ে নিয়ে নীপা আর আমি জ্বলে পুড়ে মরব কেন! নীপা আমাকে অনেক জ্বালিয়েছে, এখনও জ্বালাচ্ছে। তা জ্বালাক। শাস্ত্রে দেখলাম চিরটাকালই অসুর-শক্তির বিনাশ প্রকৃতিরই হাতে হয়েছে।

কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা।
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়সে॥

সর্বপ্রাণী—সর্ব সৃষ্টিকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলে তাঁর নাম মহাকাল, শিবলিঙ্গ হলেন মহাকাল। সেই মহাকালকে-শিবলিঙ্গকে তুমি গ্রাস করো, আত্মদেহস্থ করো তাই তুমি পরকালিকা। তুমি কালগ্রাসী তাই তুমি কালী। কালসংগ্রসনাৎ নীপা। নীপা আমাকে হত্যাও করতে পারে। সে অধিকার তার আছে। দেবাদিদেব মহাদেবই দিয়ে রেখেছেন সে অধিকার; কিন্তু তাই বলে মুষলে মারবে। আমি কি সেই কৃষ্ণ! যে কৃষ্ণ যদুবংশ রচেছিলেন, নাশ করেছিলেন, বৃক্ষশাখে বসেছিলেন নীলোৎপল পদযুগল প্রকাশ করে। আমি তো কুরু-কৃষ্ণ নই, আমি করো-কৃষ্ণ, কদম কৃষ্ণ।

নীপা তো চেয়েছিল সন্তানদের মানুষ করতে। তা হলটা কি! ছাপছোপ তো পড়ল কিছু। পড়ে কি হল! রাতের ঘুম তো গেছে। মুখে তো ঝামা ঘষে দিয়েছে। মহাদেবও তো ঘুমিয়ে পড়েছেন, মদনমঞ্জরী ছাগলে খেয়ে ফেলেছে। ছেলে বলে, ফাক ইউ। ইংলিশ মিডিয়ম তাকে এই শিক্ষাটুকুই দিতে পেরেছে। আর মেয়ে বলে, ডেট ইউ। ইংরেজী ফ্যামিলি ম্যাগাজিন তাকে মানুষ মারার বড়ি দিয়েছে। কাল তাকে দিয়েছে শিক্ষা—কেয়ার ফ্রি, ইউ আর বর্ন ফ্রি। ল্যাটা চুকে গেছে। হাজার হাজার টাকার শ্রাদ্ধে দুটি পিণ্ড। তিলকাঞ্চন করে জ্যান্ত বাপের শ্রাদ্ধের কলাপাতায়, সোহাগের ঘৃতচর্চিত হয়ে গড়াচ্ছে।

মেয়ে একদিন মদ খেয়ে টলতে টলতে ফিরে এল। থাকতে না পেরে প্রশ্ন করলুম—

'এ কি, এ অবস্থা তোর কে করে দিলে? এত দূর অধঃপতন!'

মেয়ে জড়ানো গলায় মুখের ওপর জবাব দিলে, কেন তুমি খাও না?'

'আই ক্যান স্ট্যান্ড।'

'আই উইল স্ট্যান্ড।'

সহ্য হল না। ঠাস করে এক চড়। সঙ্গে সঙ্গে সে বললে, 'আই রিটর্ন ইট টু দাই ফেস।'

নীপা ছুটে এল। সে তখন তার সেই আহামরি চুল ছেঁটে বব করে ফেলেছে। স্লিভলেস ব্লাউজ ধরেছে। মেয়ের দুটো কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলছে, 'গেট আউট, ক্লিয়ার আউট।'

মেয়ে বললে, 'হোর অফ এ মাদার শাট আপ।'

আমি লজ্জায় সরে গেলুম। বেশ বুঝলুম শুধু মদ নয়, দেহটাও বিলিয়ে এসেছে। আমার মাথা হেঁট। আর সেইটাই তো মানুষের নিয়তি—হেঁট মুণ্ড ঊর্ধ্বপদ। কাটা ঘুড়ির মতো আমার মন হুহু করে অতীত আকাশের দিকে ভেসে গেল। ম্যান, ইউ আর দি মেকার অফ ইওর ওন ফরচুন। মনে পড়ে, ঘরের মেঝেতে চূর্ণবিচূর্ণ দর্পণ, ভাঙা গেলাস, কাপের টুকরো। লাল শায়া আর লাল কাঁচুলি পরা নীপা। ঘামে ভেজা মোম শরীর। দিনশেষের আলোয় মোহময়ী। তখন তার গর্ভে এই সুকন্যা হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ। আর তুমি তখন প্লেবয়ের পাতার এক লাস্যময়ীর সঙ্গে নীপাকে তুলনা করছ। তোমার সন্তান ও-পাশে মা মা করে কাঁদছে। আর তুমি তখন ভাবছ, গোয়েলের সঙ্গে যে মেয়েটির ঘরে গিয়েছিলে, বিশেষ এক মুহূর্তে তার ছেলেও এই ভাবে কাঁদছিল। তুমি ভাবছিলে তোমার অফিসের সেই স্টেনো কি ভাবে একদিন তোমার সামনেই তার বেশ পাল্টাচ্ছিল। তুমি ভাবছিলে সহস্রধারার স্বচ্ছ জলে অমৃতার নগ্ন দেহের কথা। তোমার মনের নানা তরঙ্গের অভিঘাতে দুলে উঠেছিল নীপার গর্ভসলিল। সেই সলিলেই হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ তোমার কন্যা। প্রতিটি তরঙ্গে তৈরি হয়েছে তার মস্তিষ্কের নানা খাঁজ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য। কোথায় সাত্ত্বিকতা ? যা নেই ভাণ্ডে, তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে। তোমার সৃষ্টিই তোমার ব্যঙ্গ

We have nothing to conceal.
We have nothing to miss.
We have nothing to say
We have,
the watch has been wound up
the bills have been paid
the washing up has been done
the last bus is passing by.
it is empty

We can't complain.
what we are waiting for,

এক দিন সন্ধেবেলা দেখি আমার যুবক পুত্র ঘর অন্ধকার করে ফুল স্পিডে পাখা ছেড়ে খাটে মড়ার মতো পড়ে আছে। জগৎ সংসারে সব কিছুরই তো একটা নিয়ম আছে। সময় আছে। ঘড়ি আছে। সন্ধেবেলা কেউ ভোঁস-ভোঁস ঘুমোয়! হঠাৎ উঠে পড়ল খাট ছেড়ে। তারপর দেখি দেয়াল ধরে-ধরে বাথরুমের দিকে চলেছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'কি হয়েছে কি তোমার।'

কেমন একটা ফ্যাকাসে হেসে বললে, 'আই অ্যাম ট্রাইং টু বি এ লিজার্ড।' বলেই থ্যাস করে বসে পড়ে গলা দিয়ে অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ বের করতে লাগল। অবাক হয়ে ভাবলুম, এই হল মানুষের পরিণতি। হাজার হাজার বছরের সভ্য হবার সাধনায় কি হল, না মানুষ নেশার বড়ি খেয়ে বলছে, আমি টিকটিকি হতে চাই। আমার সব কিছু তছনছ হয়ে গেল। কয়েক হাজার টাকা রোজগার। আকাশে মাটির সামান্য উর্ধ্বে আধুনিক একটা আস্তানা, এ খুপরিতে একটা খাট, হোথায় একটা খাবার টেবিল, গোটাকতক জ্যালজ্যালে পর্দা, একটা লোহার আলমারি ঠাসা গুচ্ছের জামাকাপড়, ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট, ক্যাশ সার্টিফিকেট, পি পি এফ-এর বই, তুচ্ছ জাগতিক সম্পদসমূহ। মানুষের আসল সম্পদ ছেলে-মেয়ে। সেই দুটোই গেল গেল, ভেস্তে গেল সব। মানুষ ছেলেমেয়েকে বলে ভবিষ্যৎ। আমার সেই ভবিষ্যতটাই নেই।

নীপা হঠাৎ একদিন আমাকে বললে, তখন মাঝ রাত, 'এসো আর একবার চেষ্টা করি। শেষ চেষ্টা। দেখাই যাক না, যদি এমন কেউ আসে, যাকে ঘিরে আমাদের স্বপ্ন সফল হবে।'

আমি অবাক হয়ে নীপার মুখের দিকে অন্ধকারে চেয়ে রইলুম। সে নীপাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বয়েসের চেয়েও বয়েস বেড়ে গেছে। এ কালের 'কালচারড' সমাজসেবিকাদের মতো দেখতে হয়েছে। খাটো করে ছাঁটা চুল। আমাদের উন্মাদনার কালে নীপা শাড়ি পরে শুত। এখন যা পরে তাকে বলে নাইটি। ঝলঝলে একটা ব্যাপার। শরীরের বাঁধনও আলগা হয়ে এসেছে। কত দিন আর ধরে রাখবে। ভূমির আকর্ষণে সব ঝুলে যায়। তাজা যৌবনে যার মা হতে আপত্তি ছিল এত, সে এখন সন্তান কামনা করছে। হওয়ালে হয়তো হয়। পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে। সমাজ হাসবে। লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। বিজ্ঞান যখন বটিকা দিয়েছে তখন এ দুর্ঘটনা কেন, সে কৈফিয়তও চাইতে পারে সবাই। আর সাহস নেই। আমিই না বলেছিলুম চৈতন্য আসতে পারেন, আসতে পারেন বুদ্ধ। তবে সামান্য 'ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট' নিয়ে। চৈতন্য হয়েছেন

অচৈতন্য। বুদ্ধ হয়ে গেছেন বুদ্ধু।

আমি বলেছিলুম নীপা নম নম করে সরে পড়। সেকালের মানুষ দার্শনিকতা করে বলত, লাইফ ইজ এ গেম। জীবন একটা খেলা। এখন সত্যিই খেলা। এ জেনারেশানের সঙ্গে পুরনো চালে খেলে জেতা যাবে না। আর আমাদের তৈরি করে দিতে পারে এমন কোচও নেই। আমাদের টিম পড়ে গেছে। জার্সি খুলে ফেল। লেট আস রিটায়ার। The watch has been wound up/ the bills have been paid ॥ শেষ বাস চলে যাচ্ছে। একেবারে খালি। উঠে পড়। উঠে পড়।

সংসার থেকে মেয়েরা সহজে মন তুলে নিতে পারে না। খামচে ধরে থাকে। মেয়েদের দর্শন চিন্তাও আসে না। আমি একটু শান্তি চাই। একটু শান্তি। আমার জীবন-পাত্র পূর্ণ হয়ে গেছে। ফ্যানা উঠছে। শান্তি পেতে হলে জামাকাপড় খুলে চিতায় গিয়ে উঠতে হবে। আর মুখাগ্নি নয়, বলতে হবে লিঙ্গাগ্নি করো। তলার দিক থেকে পুড়তে পুড়তে ওপরে উঠুক।

আমার এক দক্ষিণ ভারতীয় বন্ধু বললেন, 'ডোন্টঅ থিঙ্কঅ সো মাচঅ। ইউঅ ড্রিংকঅ বি মেরিঅ। শাস্ত্র বলছেন যে তোমাকে অসৎ পরামর্শ দেবে সরে এস তার কাছ থেকে। কে শুনছে সে কথা। প্রৌঢ়ের জ্ঞানান্বেষণ হল বালিতে আঁচড় কাটা। যৌবনের শিক্ষা হল শিলালেখ। সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করা হল, 'আপনাকে তো কখনও সামান্যতম উদ্বিগ্ন দেখি না। কারণটা কি?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'কারণ আমার কাছে এমন কিছু নেই যা হারালে আমার দুঃখ হবে।' সন্ন্যাসী আরও বললেন, 'সব কিছুরই বেড়ার প্রয়োজন।'

'বেড়া কাকে বলে?'

'বিশ্বাস।'

'বিশ্বাসের বেড়াটা কি?'

'আস্থা।'

'আস্থার বেড়া?'

'কোনও কিছুকে ভয় না পাওয়া।'

জীবনে যা আসছে আর যা চলে যাচ্ছে তা মেনে নেওয়ার নামই হল জ্ঞান।

সেই জ্ঞান আমার হয়নি। নীপার তো হয়ইনি। আজকাল দু'জনেই রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারি না। সংসারটাকে ভেবে বসে আছি চন্দ্রালোকিত প্রশান্ত নদীতে ভাসমান, চলমান একটি নৌকা। আমি ধরেছি হাল, নীপা ধরেছে পাল, আর ওই দুটো আমাদের প্রাণের যাত্রী। লক্ষ্য আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বর্ণ তোরণ। যাত্রীরা চায় না আমরা হাল কি পাল ধরি। তারা ভেসে যেতে চায়

ইচ্ছামত। যে ঘাটে লাগে লাগুক। মাঝে-মাঝে তলাটা ফুটো করে দিতে চায়, ডোবে ডুবুক।

শরীর ভাঙছে। বাইরের চেহারায় ধরা পড়ে না, ভেতর খালি। বিরাট ডাক্তার হেসে হেসে বললেন, এই তো বয়েস। মৃত্যুর ছায়া পড়বে। ধীরে-ধীরে একে-একে যন্ত্র বিকল হবে। অ্যাংজাইটি, টেনসান, আধুনিক মানুষের দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। এক কাঁধে এর হাত, ও কাঁধে ওর হাত। সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিতে পারবেন! পারবেন না। কেউ পারে না। নিন এই সব করিয়ে আনুন, ই সি জি, ব্লাড, টিসি, ডিসি, ই এস আর, সুগার, স্টুল, ইউরিন। থরো চেকআপ। আলু কম, চিনি কম, মডারেট অ্যালকোহল, লিমিটেড স্মোকিং, কনট্রোলড সেক্স। একটু উদাসীন থাকার অভ্যাস। মাথা বেশি ঘামাবেন না। মাথা ঘামালেও টু অ্যান্ড টু মেকস ফোর, মাথা না ঘামালেও তাই। ভালো ঘুম হয়? হয় না। এই একটা ট্র্যাংকুইলাইজার লিখে দিলুম। জাস্ট হাফ অ্যান আওয়ার বিফোর স্লিপ।

নীপার ডাক্তার নীপাকেও ওই একই কথা বললেন। চিরনিদ্রার আগে রাতের সাময়িক নিদ্রার বটিকা। রাগ কমান, দুশ্চিন্তা কমান। ভালো ভালো, সিনিক জায়গায় মাঝে-মাঝে বেড়াতে যান। কত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। আপনার এমন সুন্দর চেহারা; কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখবেন, হাতের, গলার স্কিনে পরিবর্তন আসছে। এই দেখুন কনুইয়ের কাছে, একে বলে টোডস স্কিন। নিজের দেহকে নীপা কত ভালবাসত। নীপার দেহকে আমি কত ভালবাসতুম!

আর এক এক্সপার্ট আমাকে বললেন, রোজ সকালে হাফ প্যান্ট পরে আধ ঘণ্টা জগিং করুন। আর এক এক্সপার্ট বললেন, আসন আর ভ্রমণ প্রাণায়াম। আর একজন বললেন, মেডিটেশান। ধ্যান আর ধারণা। সব শেষে এক রসিক বললেন, ধুর মশাই, ক্রিয়েটিভ অরগ্যানটাকে চালু রাখুন। ক্যানেডিয়ান ইঞ্জিনের পিস্টন। পিস্টন থামল তো ট্রেনও থামল। বয়লারের আগুন নিবতে দেবেন না। বেলচা বেলচা কয়লা মেরে যান।

সেই সন্ন্যাসীকে প্রশ্নের মতো, আমারও প্রশ্ন, 'দেহ-বয়লারের কয়লা কি?'

'উত্তেজনা।'

'কোথায় পাওয়া যায়?'

'চলে যান ইংরিজী সিনেমাহলের পাশের সেই গলিটায়। দেখবেন সিল্কের পাঞ্জাবি পরে বসে আছে একটা লোক। বাইরে থেকে দেখলে ইনোসেন্ট বুক স্টল, খাতির জমাতে পারলেই কয়লা। রিডিং চার্জ দেবেন, নেবেন, ফেরত দেবেন, আবার নেবেন। ভাল কোক কয়লার আড়ত। পাতায় পাতায় ছবি

মশাই। দেখবেন আর লাফিয়ে লাফিয়ে উঠবেন। বুঝবেন কেন ঠাকুর বলেছেন, কা তব কান্তা।'

'ঠাকুর নয়, শঙ্করাচার্য্য।'

'ওই হল। ব্লু ফিল্ম দেখুন। জীবনের মানে খুঁজে পাবেন।'

সাহস নেই আমার। ইচ্ছে প্রবল। ভয় পাই। যেমন বলে না ভয়ে ভক্তি। আমারও তাই ভয়ে চরিত্রবান। বারনার্ড শ' সাঁচ্চা বলেছিলেন, সাহস আর সুযোগের অভাবই চরিত্র।

একজন বললেন, 'দীক্ষা নিন। ভাল গুরু ধরুন। অনেক তো হল। হাত আর হাতা এবার দুটোই গুটোন। সারেন্ডার, সারেন্ডার।' বলে বেশ সুন্দর সুরে গাইলেন—

তবে সেই সে পরমানন্দ
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে
সেই সে পরমানন্দ।

হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'শুনেছি, আপনি না কি বন্ধুর স্ত্রীকে বের করে···।'

ভদ্রলোক হাত তুলে বাধা দিলেন, 'বের করে নয়, রেসকিউ। দানবের হাত থেকে দেবী উদ্ধার।'

'নিজের স্ত্রীকে না কি···।'

'ত্যাগ। শাস্ত্র বিরোধী কাজ করিনি। দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল শ্রেয়।'

'তা আপনি উপদেশ দিচ্ছেন?'

'কেন দোব না। ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে ধর্মজীবনের কি কনেকসান! শোনেননি, যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ীর বাড়ি যায় তদ্যপি আমার গুরু রামানন্দ রায়। ধর্মব্যাধের গল্প শোনেননি।'

'আমি তো ভাই পাপটাপ মোটামুটি ভালই করেছি। আমার কি কিছু হবে!'

'আলবাত হবে। হবে না মানে!'

'তা কি হবে!'

ভদ্রলোক যেন বেশ সমস্যায় পড়ে গেলেন। আমি তখন প্রশ্ন করলুম, 'আপনার কি হয়েছে!'

'আমার বেশ একটা বিশ্বাস এসেছে। অদ্ভুত একটা বিশ্বাস। কি আপনি পাদরিদের মতো পাপ পাপ, পুণ্য পুণ্য করছেন! আমরা কি কিছু করছি? সব সেই তিনি। তোমার কর্ম, তুমি করো মা। লোকে বলে করি আমি। সব তিনি। কিছু দিন আসনে বসে বীজমন্ত্র জপ করলেই, আপনারও সেই বিশ্বাস এসে

যাবে। তখন দেখবেন, কি আনন্দ, কি আনন্দ! কোনও কাজের আর তখন জবাবদিহি করতে হবে না। সবই তো তাঁর কর্ম। আমি কে? আমি তো নিমিত্ত মাত্র।'

'তা আপনি যদি নিমিত্তমাত্র হন, আপনার পরামর্শ আমি শুনবো কেন?'

'আরে বোকা, এ আমার পরামর্শ কেন হবে! এ তাঁর পরামর্শ, এ তাঁর উপদেশ।'

'তিনি কে?'

ভদ্রলোক ধৈর্যচ্যুত হয়ে বললেন, 'তিনি যেই হোন, তাতে আপনার বাবার কি?'

'না, তিনি যদি বলে থাকেন বন্ধুর বউকে ফুসলে নিয়ে এসে, নিজের বউকে দূর করে দাও, আর সেই বউ একটি সন্তান নিয়ে ভিক্ষে করে মরুক, তা হলে সেই তিনি কেমন তিনি আমার জানা দরকার।'

'আপনাকে জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া ঝকমারি। কর্মফল বলে একটা ফল আছে জানেন? সে ফল গাছে ফলে না। ফলে কর্মে।'

'এই তো বললেন, সব কর্ম তাঁর, আমরা নিমিত্ত মাত্র, তা হলে আবার ফলের কথা উঠছে কেন? যার গাছ, তারই ফল।'

'আরে বাবা, সেটা কখন, যখন আপনি তাঁকে জানছেন, তাঁর কাছে গুরুর মাধ্যমে নিজেকে সমর্পণ করে দিচ্ছেন।'

'তার মানে আপনি আগে দীক্ষা নিয়ে, জপ ধ্যান করে, নিজেকে উৎসর্গ করে একটা লোকের বউকে বের করে আনলেন, আর নিজের বউকে মারলেন লাথি, তাই তো?'

ভদ্রলোক থতমত খেলেন।

আমি বললুম, 'এ সমর্পণের কি মানে হয়! আপনি একটা মেয়েছেলে না ধরে, আরও বড় কিছু ধরতে পারতেন। তিনি আপনার মাধ্যমে এই রকম একটা ইতর কাজ করালেন!'

'তাঁর ইচ্ছে হল। তাঁর ইচ্ছের ওপর তো কথা চলে না।'

'তা এই কর্মটির ফল কে ভোগ করবেন, তিনি! এপাশ, ওপাশ থেকে দুটো কেস ঠুকে দিলে, কে জেলে যাবে, আপনি না তিনি!'

'আরে মশাই, শেষ কথাটা তো এখনও আপনাকে বলা হয়নি। সেটা হল তিনিই আমি, আমিই তিনি।'

'তার মানে আমার সঙ্গে এতক্ষণ কে কথা বলছেন? আপনি না তিনি! ব্যাকরণের এমন গোলমালে তো জীবনে পড়িনি।'

'আরে মশাই তিনি ব্যাকরণ-ট্যাকরণের অতীত।'

'তার মানে আপনার আমার নেই। ব্যাকরণ ছাড়া যেমন ভাষা অশুদ্ধ, আপনিও সেই রকম!'

'আরে মশাই, আর একটা মহাসত্য তো বলাই হয়নি, কর্তাও নেই কর্মও নেই।'

'তা হলে কি আছে?'

'কিছুই নেই। সব স্বপ্ন। দীর্ঘস্থায়ী স্বপ্ন।'

'তার মানে, আমরা ঘুমোচ্ছি? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অফিস যাচ্ছি, আহারাদি করছি, স্বপ্ন দোষে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই আপনার দুটো ছেলে হয়ে গেল অবৈধপক্ষে।'

ভদ্রলোক ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'ধর্ম নিয়ে, দর্শন নিয়ে, আত্মজ্ঞান নিয়ে ইয়ারকি করবেন না।'

'করলেই বা, সবই তো স্বপ্নে ঘটছে।'

'আপনার কিছু হবে না মশাই' বলে ভদ্রলোক সরে পড়লেন।

কত ভাবে মানুষ কর্মকে পাশ কাটাতে চাইছে।

Here is a thing
There is a thing
Some thing looks like this
Some thing else looks different
How easily one can blow out
The whole blossoming earth.

হাউসিং কোঅপারেটিভের মাতব্বররা এসে বললেন, আরও পঁচিশ হাজার ক্যাশ ডাউন করতে হবে। যাঁরা শুরু করেছিলেন তাঁরা, 'তোমার কর্ম তুমি করো মা', বলে সরে পড়েছেন। দু লাখ গলে গেছে। আমার ভাঁড়ে মা ভবানী। আরও পঁচিশ মানে উটের পিঠে শেষ খড়ের টুকরো। হাঁটু মুড়ে বসে পড়তে হবে। অবাঙালী ব্যবসাদাররা ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছে। আজ বললে কালই ভাল দামে হাতবদল হয়ে যাবে। মাঝে-মাঝে মনে হয়, কি হবে, এই ঠাটবাটে! বাড়িতে তো পাঁচ মিনিটও তিষ্ঠনো দায়। নীপার সঙ্গে নীপার মেয়ের অনবরত চুলোচুলি। এতবার বলছি, নীপা ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। ওদের ওপর থেকে মন তুলে নাও। নীপা শুনবে না। বললেই রেগে যায়, তুমি অপদার্থ, স্বার্থপর, শয়তান, নিজেরটি ছাড়া কিছু বোঝ না। তুমি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াতে পার, আমি পারি না। ওরা দুটোতে আমাদের মাথা হেঁট করে দেবে তা হবে না। গলা টিপে মেরে ফেলব, সেও ভালো।

পুলিসে ধরবে।

জেল খাটব।

এক দিন মনে হল দুটোকে ডেকে সরাসরি শেষ কথাটা জেনেনি। কি চাস তোরা ? রাখতে চাস না ভাঙতে চাস। ভাঙতেই যদি চাস তো, আমি নিজে হাতে ভাঙি। ওদের সামনে যেতে ভেতরে এমন একটা মানসিক প্রতিরোধ গড়ে ওঠে, আর পারি না। বিশাল একটা ব্যবধান তৈরি হয়েছে। মাঝে ঘৃণা আর অভিমান। কোনও সেতু নেই। যখন ভাঙার চিন্তা আসে তখন মনে হয়, কত কষ্ট করে, তিলতিল করে সব হল, ভাঙতে তো এক দিনের বেশি সময় লাগবে না। ভাগ্যের কাছে এই ভাবে হেরে যাব। এরা কি সত্যিই অমানুষ ! কোনও বন্ধন, কৃতজ্ঞতা, অনুভূতি সত্যিই কি নেই ! আমি তো সব সময় এদের কথা ভাবি। মনে হয় সব ছেড়ে সরে পড়ি, পারি না। মনে হয় এদের কি হবে ! আমি ভোগী, আমি শয়তান, স্বার্থপর, আমার চরিত্র আলগা, সবই মানছি ; কিন্তু আমি ওদের জন্যে যতটুকু ভাবি, ওরা কি আমার জন্যে তার সিকির সিকি ভাবে !

আমার পিতা বলতেন, দ্যাখো, ডোন্ট প্যাম্পার এ চাইল্ড। ছেলেদের একটু দুঃখ কষ্টে রাখতে হয়, তা না হলে তারা মানুষ হয় না। বলতেন মাকে। আমাদের ছাত্রজীবনের সম্বল ছিল, দুটো প্যান্ট, দুটো জামা। একজোড়া জুতো। আমাদের জলখাবার ছিল রুটি, কুমড়োর ছক্কা। যে-দিন তাইতে ছোলা পড়ত, সেদিন আমরা আনন্দে লাফিয়ে উঠতুম। আবার যেদিন এক চামচে ঘি পড়ত, সেদিন মনে হত স্বর্গে যাচ্ছি। আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক এসেছিল যখন আমরা থার্ড ইয়ারে পড়ি। আমাদের ছাত্রজীবন কেটেছে হারিকেনের আলোয়। জ্বলে জ্বলে মাঝরাতে কাঁচে কালি পড়ে যেত। সেই ভুতুড়ে আলোর সামনে বসে আমরা পরীক্ষার পড়া পড়তুম। দু' দিকের দু' বিছানায় বাবা আর মা জেগে থাকতেন। মাঝে-মাঝে বলতেন, এবার শুয়ে পড় বাবা। কাল আবার খুব ভোরে উঠে পড়বি। জ্ঞান হবার পর, বাবা আর মাকে কখনও এক বিছানায় শুতে দেখিনি। কখনও দেখিনি দু'জনে ঝগড়া কি ইয়ারকি করছেন। শুনেছি, সন্তানের জন্মের পর স্বামী-স্ত্রীতে ভাইবোনের মতো থাকতে হয়। আমি চোখেও দেখেছি। বছরে দু'বার রাশ সামান্য একটু ঢিলে হত। বিজয়া দশমী আর ফাগুয়া। সংসারটা তাঁদের কালে ছিল লাগাম আঁটা ঘোড়ার মতো। যেদিকে খুশি, যেভাবে খুশি ঘোড়ার মতো চালাতেন। রাশ টানতে জানতেন, জানতেন আলগা দিতে।

সেই পিতা-মাতার সন্তান আমি। আমার কেন এ হাল ! একেই কি বলে কাল ! ওই যে সেই পাপী লম্পট লোকটা, যে আমাকে ধর্ম শেখাচ্ছিল, তার কথাই কি তা হলে সত্য। তাঁর খেলা। সেই তিনি। যাঁর অপর নাম ডেসটিনি। না তিনিই খেলছেন বহু রূপে। একোহহং বহুস্যাম। যখনই তাঁর ইচ্ছা হচ্ছে,

হেঁট মুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হয়ে চলে আসছেন মায়ার জগতে। কোথাও সাধু, কোথাও তস্কর, কোথাও যোগী, কোথাও ভোগী। তিনি সর্প হয়ে দংশন করছেন, আবার তিনিই ঝাড়ছেন ওঝা হয়ে।

রাজপুরীতে সন্ন্যাসী গেল ভিক্ষা চাইতে। রাজপ্রহরীরা পিটিয়ে রাস্তায় শুইয়ে দিলে। খবর পেয়ে মঠ থেকে অন্য সন্ন্যাসীরা এসে, মুখে জল দিতে লাগল। যেই জ্ঞান হল তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, কে মেরেছে। সন্ন্যাসী বললেন, এখন যাঁরা জল দিচ্ছেন, তাঁরাই একটু আগে প্রহরী হয়ে মেরেছেন।

বড় কঠিন এই জীবন দর্শন। কে খেলায় আমি খেলি বা কেন?

মানুষের জীবনের শৈশবের দশটা বছরই হল ঠিক-ঠিক বাঁচা। নীল চোখে, নীল আকাশ। ওই পাখী, ওই গাছ, ওই নদী, ওই ঘুড়ি, ওই লাটাই। অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, ঈগল পাখী পাছে ধরে। মা। মা ছাড়া জগৎ অন্ধকার। খেতে দিলে খাই, মারলে কাঁদি, ফেলে দিলে পড়ে থাকি। কি সুন্দর বলে সব কিছু ধরতে ছুটি, ফড়িং থেকে টিকটিকি। ওর নাম ফুল, লাল, হলদে, নীল। আমার বেড়াল, তোমার ময়না। দিনে পৃথিবীটা বিশাল, প্রান্তর, সরোবর, ধানের সবুজ ঢেউ, হাঁসের সাদা পালক। রাতে পৃথিবী ছোট হতে হতে ছোট্ট একটি ঘর, আরও ছোট। শিশুর রাতের পৃথিবী মায়ের বুক। দশ পেরলেই বলতে পারি, বড় হচ্ছি না, এগোচ্ছি মৃত্যুর দিকে। বয়েস হল পঁচিশ, মানে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলাম পঁচিশ বছর। পঞ্চাশ মানে, ফেলে দে, ফেলে দে। ব্যাটাকে একপাশে সরিয়ে চুপ করে বসিয়ে রাখ। টিকিট কাটা হয়ে গেছে, বিল মেটানো হয়ে গেছে। ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালে চোখ রাখ, পাখা পড়েছে, ঘণ্টা বেজেছে। শিশুর চোখে ট্রেন জগৎ দেখার যন্ত্র। প্রৌঢ়ের চোখে ট্রেন বিদায়ের বাঁশী।

কোনও এক বাড়িতে সবাই একই স্বপ্ন দেখেছিল এক রাতে।

কি স্বপ্ন!

দিন দিন, প্রতি দিন তারা একটু একটু করে ছোট হতে হতে
শেষে মৃত্যু।

ভাগ্য ভাল তাই কি মনে হল বসে না থেকে লেগে গেল কাজে
কি কাজ!

যে সব বড় মাপের বিশাল কফিন ছিল মাপ মতো কেটেকুটে
করে ফেললে ছোট, আর সেটাকেই বগলে নিয়ে ঘোরে।

ঠিক কাজই করেছে।

প্রথম দিকের ছোট হওয়াটা তেমন নজরে পড়েনি,
মাঝে মধ্যে থেমে থাকত মাসের পর মাস।

'তা হলে বলছেন আমরাই অ্যান্টিসোস্যাল ?'

'হরেদরে সেই রকমই দাঁড়াচ্ছে। কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখানো। এসব কলকাতার পশ এলাকায় চলে। মধ্যবিত্ত পাড়ায় নারী স্বাধীনতা মানায় না।'

'মধ্যবিত্ত পাড়ায় ঘরে বসে স্ক্যান্ডাল চলতে পারে, কি বলেন ?'

ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কার ঘরে আপনি স্ক্যান্ডাল দেখলেন, যে এমন সুইপিং রিমার্ক ! বেডরুম, বাথরুম, ড্রয়িংরুমে কোনও পার্থক্য থাকবে না ! ইজ ইট প্রগতি ?

'আপনি নিজেই তো মশাই স্ক্যান্ডালাস। আপনি আপনার মেয়ের বয়সী মেয়ের দিকে কি ভাবে, কত ভাবে, কত দিন তাকাচ্ছেন একবার ভাবুন। সে যদি সেক্স থ্রো করে থাকে তা হলে ওই ছেলেদের মতো আপনিও সমান কাবু। ইউ রেলিশ ইট। আসলে কি জানেন, এই বয়েস থেকেই মানুষকে পারভারসানে ধরে। আপনার বারান্দা আর আমার বারান্দা মুখোমুখি।'

'রাবিশ, সিনিক, করাপ্ট।' ভদ্রলোক রেগেমেগে চলে গেলেন।

আমি আমার মেয়ের দিকে কখনও তাকাই না। তাকাই না একটা কারণে, আমার মনে পড়ে যায়। আমার পুরনো সব পাপের কথা। সে-সব পাপ এখন রসা 'রামের' মতো, আমার অন্ধকার সেলারে পাশাপাশি বোতলে সাজান। নড়াচড়া করলেই ঠুং ঠাং শব্দ শুনতে পাই। গোয়েলের পাল্লায় পড়ে মেয়ের বয়সী মেয়েছেলের ঘরে ফুর্তি করতে যাইনি ! প্রথমটায় না না করে, হুল্লোড়ে মেতে উঠিনি তারপর। রাত গড়িয়ে চলেনি মাঝরাতের দিকে ! মনে যেন আগুনে পুড়িয়ে সিল মেরে দিয়েছে। যা আর জীবনে উঠবে না। লোহা একবার পাকিয়ে স্ক্রু হয়ে গেলে আর কি সোজা করা যায় ! স্ক্রুই থেকে যাবে। আমার মনের সেই অবস্থা।

একদিন রাত এগারটা বেজে গেল, বারোটা বেজে গেল, মেয়ে আর ফেরে না। নীপা নিচের দরজায়, আমি বারান্দায়। চরাচরে নেমে এসেছে রাতের প্রশান্তি। কোথায় কেউ সংসারের ফাঁদে ধরা দিতে চলেছে ; ভেসে আসছে সানাইয়ের মন কেমন করা সুর। বেশ লাগে এই সুর। এ যেন একই সঙ্গে আগমনী, আর বিদায়ের বাঁশী। চোখের সামনে ঝুলছে রাতের নীল মশারি, তার গায়ে ঝোলান ধকধকে তারার তবকতক্তি। ফিনফিনে সুরার মতো ঝিলঝিলে বাতাস। এত শান্তি তবু অশান্তি। মেয়েটা গেল কোথায় ! এই বিশাল, বিশাল, বিশাল শহরের কোন কন্দরে ঢুকে আছে কে জানে ! নিজে না এলে কে কোথায় খুঁজতে যাবে। নীপা ছটফট করছে। আমার ছটফট করছে মন। এমন সব কুৎসিত চিন্তা আসছে। গ্যাং রেপ করে কোথাও ডাম্প করে দিলে না তো !

আজকাল সবই সম্ভব। অসম্ভব শব্দটা শুনেছি আমাদের মতো মূর্খের অভিধানেই পাওয়া যায়।

রাত দেড়টার সময়, আমরা দু'জনে আমাদের ঘরে মুখোমুখি বসলাম। তার আগে আমরা মেয়ের ঘর তন্নতন্ন করে পুলিসী কায়দায় খুঁজে এসেছি ক্লুর সন্ধানে। যদি কোনও চিঠিচাপাটি পাওয়া যায় গৃহত্যাগের। অসংখ্য প্রেমপত্র। মুখ চুম্বনের ইচ্ছা। একালের উন্নাসিক পত্র-পত্রিকা। স্ক্যান্ডালাস পত্রিকা। ইরেটিক বই ছবি। এমন কি সিগারেটের প্যাকেট। মেয়েও মায়ের মতই অগোছালো। এখানে ওখানে ছাড়া জামাকাপড়। দেরাজের হাতলে একটা ব্রা ঝুলছিল। সুন্দর কাজ করা। বাপ হলেও পুরুষ তো! নজর চলে গিয়েছিল। দুটো ভাবনা এসেছিল মনে। মেয়ের দিকে যেভাবে তাকানো যায় না, সেই ভাবেই চেয়েছিলাম প্রাণহীন ওই বস্তুটির দিকে। নীপার সঙ্গে তুলনা করেছিলুম আকার আকৃতির। মনে পড়েছিল, আমাদের মিলনের সেই বসন্তদিবসে, সেদিনের প্রেমিকা, আজকের মা বক্ষবন্ধনী ছুঁড়ে দিয়েছিল চিলেকোঠার কোণে। আটকে গিয়েছিল সেই অজানা মহিলার ছবির মাথায়। সে বস্তু এত কারুকার্যময় ছিল না। সাদামাঠা। বিদ্রোহ প্রশমনের শস্তা ব্যবস্থা। মনে পড়েছিল আমার সেই মাদ্রাজী বন্ধুর সঙ্গে জীবনের প্রথম ক্যাবারে দেখার কথা। সেই লাস্যময়ী এই রকমই কিছু একটা পরেছিল যেন। নিমেষে ওই সব ভাবনা ঘুরিয়ে দিয়েছিলুম। মনে মনে বলেছিলুম, তুমি নির্মল করো, মঙ্গল করো।

এখন দু'জনে মুখোমুখি বসে আছি স্তম্ভিত হয়ে। মাথার ওপর সাদা ডোমে সাদা আলো। যেন সার্জারি হচ্ছে। মিডনাইট এমারজেন্সি। আমাদের সামনে অপারেশান টেবল। তার ওপর 'ইথারাইজড' আমাদের মেয়ে। মনে হল নীপাকে প্রশ্ন করি, ক্যাবারে-ট্যাবারে নাচছে না তো! শুনেছি ভাল রোজগার। অভ্যাস হয়ে গেলে কিছুই নয়। রাজভোগ, কমলাভোগও তো কাঁচের শো-কেসে থাকে। এত দুশ্চিন্তা, তবু আমরা কেমন দু'জনে কবিতার মতো বসে আছি! সময়ের চলে যাওয়াটা আমরা তেমন বুঝতে পারি না। সেদিন পেরেছিলুম। ঘড়িতে চিন্‌চিন্ করে দুটো বাজল। তিনটে বাজল। শেষ রাতে অদ্ভুত একটা বাতাস ওঠে, সেই বাতাসটা উঠল। দিনের দুশ্চিন্তায়, গোটা দুই প্যাঁচা বাইরে কোথাও তারস্বরে ডেকে উঠল, খই খ্যাঁচা, খই খ্যাঁচা। এক সময় মনে হল সময়ের নদীতে সত্যিই আমরা দু'জনে একটা নৌকো বাইছি। কোন ঘাটে ছেড়েছিলুম আর কোন ঘাটে চলেছি। অনেক দূর চলে এসেছি। সামনে অথৈ জল। এখনও পার দেখা যাচ্ছে না।

নীপা □ মনে হচ্ছে আজই ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করি।

আমি □ সে তো পালানো।
নীপা □ ওসব সেকেলে আদর্শ।
আমি □ আমরা তো সেকেলেই।
নীপা □ আমাদের কেউ চায় না।
আমি □ তবু আমরা থাকব, জোর করে থাকব।

হঠাৎ আয়নার দিকে চোখ চলে গেল। সেবার ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা ভাঙার পর আবার ভালো একটা আয়না লাগানো হয়েছে। আগের চেয়েও দামী। মাঝ রাতে আয়নায় দু'জনের প্রতিফলন দেখে মনে হল, দুটো ভুত বসে আছে। দুটো ফসিল। একটা বয়সের পর মানুষ এই ভাবেই থাকে। আমাদের প্রতিচ্ছবি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। মাথার ওপরের আলো মরে আসছে। আকাশে দিনের চোখ খুলছে।

হঠাৎ অসাধারণ একটা কবিতার লাইন মনে পড়ল □

One morning his face fell out of the mirror
into his hands: he let it fall.

এই সকালেই আমার মুণ্ডটা ওই আয়না থেকে খুলে পড়ে যাবে আমার দু' হাতের ওপর। আমি ধরে রাখার চেষ্টা করব না। পড়ে যাক মাটিতে। এইবার সারা শহর আমি তোলপাড় করে ফেলব। ভোরে যেমন ফোটা ফুলের বাহার, বহুদিন পরে নীপাকে আমার সেই রকম মনে হল। প্রথম থেকেই নীপার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, তবে যৌবনে তার সব রকমের আবেগই একটু বেশি ছিল। ইদানীং সেই আবেগ মরে এসেছে। দীপ্তিটা আছে। চেহারার ধার বজায় আছে। নীপা বসে আছে, বিষণ্ণ, দুঃখী দুঃখী ভাব। জলে নেমে দু' হাত দিয়ে স্রোত ধরার চেষ্টা করেছিল। এখন ক্লান্ত, হতাশ। ভোরের বিষণ্ণ ফুল। এখন মনে হয় নীপা আমার গর্ব, আমার অহংকার। আমার কত বন্ধু-বান্ধবের মাথা ঘুরিয়েছে! গোয়েলের মতো 'ফাস্ট'-ছেলে, যে কি না বলের আগে দৌড়তে পারে তাকে নীপা নাকানি-চোবানি খাইয়েছে □

আমরা কেউ দেবতা নই
এদিক সেদিক, ছোটখাট ভ্রান্তি হতেই পারে।
সাদা কাগজে অসাবধানে এক ফোঁটা কালি
যদি পড়েই থাকে, কলম তো ধরা আছে হাতে।
ফোঁটাটাকে টেনে টেনে সরু বাঁকা অক্ষরে
লিখে যাও পরের কাহিনী।

প্রথম পাখির অস্ফুট কণ্ঠ শোনামাত্রই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম। আমার

একটা ইলেকট্রিক কেটলি ছিল রাত-বিরেতে চা করার জন্যে। বেশ বিলিতি-বিলিতি দেখতে। মেপে দু' কাপ জল ঢেলে প্লাগে গুঁজে দিলুম। সিঁ সিঁ শব্দ। আবার আসছে কুৎসিত চিন্তা। ভোরের কোনও ধান ক্ষেতে পড়ে আছে মেয়েটার দেহ। পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, এঁকে-বেঁকে একটা সাপ। লিপস্টিক লাগান লাল ঠোঁটে ভিনভিন করছে মাছি। আমার কাম যেন ডিমের কুসুমের মত টলটল করছে সস-প্যানে। যাত্রী আমরা দু'জনেই। ব্যভিচারের পথে আমি কিছু দূর গিয়ে সংস্কারের টানে ফিরে এসেছি। আমারই রক্তের রেণুর সাহসে কালের মাত্রা যোগ করে সে আরও অনেকটা এগিয়েছে। বিচারকের আঙুল যদি তুলতে হয়, তুলতে হবে পূর্বপুরুষের দিকে □

তুমি তো কেবল ছবি নও
তোমার কর্মেই আছে—
আমাদের ভবিষ্যৎ।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বাঁ হাতে ক্লান্ত ভঙ্গিতে নীপা কানের পাশের চুল সরাচ্ছে। আমি উল্টো দিকে বসে চা খেতেখেতে দেখছি, এমন সময় বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। শব্দ শুনে মনে হল বেশ ভারি গাড়ি। আমরা দু'জনেই পড়ি কি মরি করে ছুটলুম বারান্দায়। নিচে দাঁড়িয়ে আছে পুলিসের হৃদয়হীন একটি ভ্যান। সাদা পোশাক-পরা একজন অফিসার নেমেছেন। ভোরের আলোয় তাঁর সাদা পোশাক বেশ দেখাচ্ছে। তিনি ওপরে তাকাতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল।

নীপা বেশ জোরেই বললে, 'পুলিস, খুন, মার্ডার।'

আমি নীপার মুখ চেপে ধরলুম, 'চেঁচিও না।' সামনের বারান্দার দিকে তাকালুম। আমার প্রতিবেশী যেন শুনতে না পায়। জানতে না পারে। 'সাইলেন্স, সাইলেনস।' এখুনি সে কাশতে কাশতে বাইরে আসবে। রোজ ওর কাশি শুনে মনে মনে বলি □ হি উইল কাফ আউট এ ডে। ও দেখতে পেলেই আমাদের প্রেস্টিজ চলে যাবে। মধ্যবিত্তের আগলাবার মতো একটি জিনিসই আছে, একটি মাত্র সম্পদ—প্রেসটিজ।

কালো গাড়ি থেকে একটি স্ট্রেচার নেমে এল। আমি ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে নীপাকে সাবধান করছি, চেঁচিও না। এ আমাদের পাপ। মনে মনে পুলিসদের বলছি, তাড়াতাড়ি ঢোকান না মশাই, এখুনি যে পাড়ার চোখ ড্যাবড্যাব করে উঠবে। রেসকোর্সের ধারে ঘাসের ওপর সারা রাত পড়েছিল। সেই জায়গাটায়, যেখানে বিজনেসম্যানদের ক্যাপ্তেন ছেলেরা নতুন নতুন গাড়ি পার্ক করে ভেতরে বসে একটু মুক্ত বায়ুতে পান ভোজন করে। পুলিসের অসীম

দয়া। ফাটকে ভরে দিতেই পারত। কন্ডিশান দেখে সাহস পায়নি। যদি মরেটরে যায়। যার ধন তাকেই দিয়ে গেল। হাতব্যাগে ঠিকানাপত্র পেয়েছে। সব চেয়ে লজ্জার কথা, পুলিস-অফিসারটি এ-পাড়াতেই থাকেন। আমাদের চেনেন।

নীপা চাপা গলায় বলেছিল, 'ওদের দাঁড়াতে বলো, আমার মিনিট পাঁচেক সময় লাগবে।'

আমি বুঝতে পারিনি কি বলতে চাইছে। একটা মাথার বালিশ নিয়ে এগোচ্ছে।

'কি করবে কি ?'

দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'ওকে আমি আজ মুখে বালিশ ঠেসে শেষ করে দিয়ে জেলে যাব।'

আমি ফিসফিস করে ওরা যেন না শুনতে পায় এইভাবে বললুম, 'একটা বেশ্যাকে মেরে জেলে গিয়ে কি লাভ। এর চেয়ে আরও ভাল ভাল কাজ আছে করার মতো। ওকে মারার ঘাতক তো রেডি হয়েই আছে। আজ আর কাল।'

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে পুলিস অফিসারকে বললুম, 'আরে আসুন আসুন। হ্যাভ এ কাপ অফ মরনিং টি।' চায়ে আপ্যায়ন করার ইচ্ছে আমার ছিল না। নীপাকে ব্যস্ত রাখার ছলে বললুম। জানতুম ভদ্রলোক না বলবেন না। দিন কয়েক আগে আমাদের অফিসে ছেলের চাকরির কথা বলেছিলেন। আমি বলেছিলুম, চেষ্টা করব।

নিজের লজ্জা ঢাকার জন্যে সেই প্রসঙ্গই যেচে তুললুম, 'সাতটা টেকনিক্যাল পোস্টে ডিরেক্ট রিক্রুটমেন্ট হবে, এইবার আপনার ছেলের একটা ব্যবস্থা করে দোব।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার ছেলে নিজেই একটা কি জোগাড় করে ফরেন চলে গেছে।'

'কবে গেল !'

'তা হবে, মাসখানেক তো বটেই। আপনি বরং আমার শ্যালকের জন্যে পিওন-টিওন যা হয় একটা চেষ্টা করুন। বেচারা প্রেম করে বিয়ে বাঁধিয়ে বড় বিপদে পড়েছে। সে রকম এডুকেশানও নেই।'

মনে একটা ছেঁকা লাগল। ভদ্রলোকের ছেলে কেমন ফরেন চলে গেল। আর আমার ছেলেটা ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে দেয়াল বেয়ে টিকটিকি হবার চেষ্টা করছে। কাল সন্ধেবেলা কোথা থেকে ঘুরে এসে সেই যে দরজা বন্ধ করে শুয়েছে, ঢাক-ঢোল বাজালেও উঠবে না। ওই সব ওষুধের একটা পিরিয়াড আছে। দিন দিন রক্তশূন্য ফ্যাকাসে চেহারা হয়ে যাচ্ছে। ও এমন জিনিস, যাকে

ধরে তাকে ফিনিশ করে দেয়। আমি দিন গুনছি, কবে সেইদিন আসবে যেদিন ওই ঘর ভেঙে ডেডবডি বের করতে হবে।

অফিসার বললেন, 'আপনাকে আর আপনার শ্রীমতীকে চিনি তাই, তা না হলে বেশ ঝামেলা হয়ে যেত!'

'সে তো বটেই। তবে চেনা বলে লজ্জা করবেন না।'

'না না, সে কি কথা! ইট ইজ আওয়ার ডিউটি। সেই কোন ছেলেবেলায় পড়েছি—ডু ইওর ডিউটি কাম হোয়াট মে। জানেন তো, এই অনেস্টির জন্যে আমার কিছু হল না। এতদিনে বাড়ি-ফাড়ি করে ফেলতে পারতুম।'

'আরে মশাই, আপনারা হলেন ওলড ভ্যালুজ।'

ভদ্রলোক এত কথার পর আমতা আমতা করে বললেন, 'আপনার মেয়ের এইবার একটা বিয়ে দিয়ে দিন। দেখছেন তো, কি কাল পড়েছে। দেখুন ওই তল্লাটে সব দিন তো আর আমার ডিউটি থাকবে না।'

আমি বললুম, 'এই তো আর কটা দিন। সামনের মাঘেই বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। খুব সুন্দর একটি ছেলে পেয়েছি। ফরেনে চাকরি করে। শুধু আপনার সম্মতির অপেক্ষা।'

'আমার সম্মতি!' ভদ্রলোক হাঁ হয়ে গেলেন।

'হ্যাঁ, আপনার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিলে কেমন হয়! আমরা একটা সম্পর্কে আসতে পারি। আমার মেয়ে অসুন্দরী নয়। বেশ একটা বিলিতি-বিলিতি ভাব আছে।'

ভদ্রলোক চায়ে চুমুক দিতে ভুলে গেলেন, 'না মশাই, ও মেয়ে আমরা সামলাতে পারব না।'

'পারলে আপনারাই পারবেন। পুলিস ছাড়া, এ-কালের ছেলে-মেয়েকে সামলানোর সাধ্য আর কারুর আছে। বেচাল দেখলেই রুলের গুঁতো।'

'তা হলে আমার যেদিন ইউনিভারসিটিতে ডিউটি পড়বে গিয়ে দেখবেন। আপনার ধারণা পাল্টে যাবে। কালঘাম ছুটিয়ে দেয় মশাই। লাঠি, টিয়ারগ্যাস সব ফেল মেরে যায়।'

'আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি। আইডিয়েল ম্যাচ। আমি লাখখানেক খরচ করব। তাছাড়া আপনার একটা স্নেহও পড়ে গেছে।'

'স্নেহ! এই সব মেয়েকে স্নেহ। এরা ওই হোটেল, রেস্তোরাঁ, ময়দান আর গাঁজার আড্ডাতেই চলে। সংসারে অচল।'

ভদ্রলোক কোনও রকমে চা শেষ করে উঠে পড়লেন। যেন পালাতে পারলে বাঁচেন।

আমি বললুম, 'প্রস্তাবটা দেওয়া রইল। বিবেচনা করে দেখবেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি আর্মি কি নেভি অফিসার খুঁজুন। তাদের হাতে হ্যান্ডওভার করে দিন।'

গাড়ি চলে গেল। সামনের বাড়ির প্রতিবেশীর ঘুম ভেঙেছে। তিনি কাশছেন, আর একটু করে সূর্য উঠছে। ওদিকের এক বৈষ্ণব গৃহে খোল করতাল বাজিয়ে হরিনাম হচ্ছে। সূর্য উঠছে। পাপের জগৎ, পুণ্যের জগৎ, দু' জগৎকেই উদ্ভাসিত করে সূর্য উঠছে। দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে আছে নীপা। বিছানায় তার মেয়ে। সারা রাত ঘাসে, জলে পড়েছিল, খোলা আকাশের তলায়। আমার মনে হয় যাদের সঙ্গে গিয়েছিল, তারা মরে গেছে বা মরে যাবে ভেবে ফেলে পালিয়েছিল। ভোরের বাতাসে হুঁশ ফিরেছে। ভোর তো ফোটার কাল। ফুলও ফোটে, মেয়েও ফোটে। মেয়েটার মুখটা কি ইনোসেন্ট!

আমি □ ডাক্তার দেখি। একবার থরো চেকআপ।

নীপা □ ডাক্তার? একজন কিলার দেখ। আজই শেষ করে দাও।

আমি □ আমাদের মেয়ে।

নীপা □ বিচ।

আমি □ আমরা দু'জনে কিন্তু মানুষ ছিলুম।

নীপা □ আমাদের রক্তে ভাইরাস আছে।

আমি □ তুমি তো তোমার ছেলেকে কিছু বলো না!

নীপা □ ও ছেলে।

আমি □ আমাদের ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমার নিন্দে বেশি হয়েছিল কেন? আমিও তো ছেলে।

নীপা □ সে আমার বাবার জন্যে।

আমি □ তিনি লিবার‍্যাল ছিলেন। নট কনজারভেটিভ।

নীপা □ তিনি ছিলেন চালুনি তাই ছুঁচের বিচার করতেন না। তাঁর আরও দুটো বউ ছিল। বিয়ে না করা বউ। তাই আমাদের সঙ্গে চুক্তি করে চলতেন।

আমি □ আমরাও সেই রকম একটা চুক্তি করে চলি না কেন? তোমরা তো কেউ খারাপ হওনি। তোমার বোনেরা তো সকলেই মানুষ হয়েছে।

নীপা □ মানুষ হলেও সুখী হয়নি।

আমি □ তুমি?

নীপা □ আমার সুখ তো দেখছ! এঘরে একটা ওঘরে একটা।

আমি □ আমি ?

নীপা □ তুমি শয়তান। শয়তানরা সদা সুখী।

আমি □ আমি শয়তান! তোমাকে মা করে ছেড়ে পালাইনি।

নীপা □ পালাতে পারতে না। সেই সময় আমি ছিলাম অজগরের নিঃশ্বাস। আমার অনেক ছাগলের তুমি একটি।

আমি □ শয়তান আর সাপ কিন্তু এক। আজ চোখের সামনে যা দেখছ তা আমাদেরই সৃষ্টি। তোমার উদাসীনতা, আমার কাম, তোমার পাপ আমার দুর্বলতা।

নীপা □ আমার রক্তে পাপ নেই।

আমি □ তুমি গোয়েলের সঙ্গে শুয়েছ, তুমি তোমার নৃত্যগুরুকে দেহ দিয়েছ, তুমি এক ইম্প্রেসারিওর সঙ্গে হোটেলে রাত কাটিয়েছ। তোমার বিছানায় অতিথির তালিকা দীর্ঘ।

নীপা □ ও তোমার নোঙরা মনের সন্দেহ। যে যেমন, জগৎকে সে তেমন দেখে। আমি তোমার গামলায় ইঁট মারতে চাই না, ছিটকে এসে আমারই গায়ে লাগবে।

আমি □ এখন পথ ?

নীপা □ একটাই। হয় হত্যা না হয় আত্মহত্যা।

জীবনটা একটা দেয়ালের সামনে এসে থেমে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এগনোও যাবে না, পেছনোও যাবে না। এ যেন 'বারলিন ওয়াল'। এইবার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ো। বসে বসে বসে বসে। সেই ছেলেবেলায় শোনা মাতালের গল্প। আমাদের বাড়ির রাস্তার দিকের রকে শুয়ে শুয়ে, মাঝরাতে এক মাতাল আর এক মাতালকে রাজপুত্রের গল্প শোনাচ্ছে, যাতে যাতে, যাতে, যাতে। দৈহিক মৃত্যুর ঢের আগেই মানুষ মরে যায়। যত দিন কর্ম ততদিন জীবন। মোটর গাড়ি যত দিন চলে, ততদিন তাকে ঝকঝকে করে রাখা। অয়েলিং ক্লিনিং। সার্ভিসিং। যেই ইঞ্জিনের দম ফুরলো, পড়ে রইল খোলা মাঠে। জং ধরে, জং ধরে। খোলটা আছে, তবে রাজপথে নেই, দৌড়পথে নেই, পড়ে আছে একপাশে।

জীবনে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী জুটে যায়। একজন বললেন, 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, লিভ লাইক এ পাঁকাল মাছ। আপনি মশাই সংসার সংসার করে অত হেদিয়ে মরেন কেন। সব মানুষই নিজের নিজের ভাগ্য নিয়ে আসে। নিউটনের ভাগ্য নিয়ে নিউটন, মিল্টনের ভাগ্যে মিল্টন, আর তা না হলে মাল টন। এক টন, দুটন। আপনার সংসার পেছনে পেছন শ্মশান পর্যন্ত আসবে।

আফ্‌টার দ্যাট হোয়াট ? মহাশূন্যে পাকসাট। অরুচি হলে মায়েরা কি বলতেন, রুচিকর কিছু খা। আচার, আদা কুঁচি। জিভের স্বাদ ফিরিয়ে আন। আপনিও জীবনের স্বাদ ফিরিয়ে আনুন। নিজেকে অ্যানালিসিস করুন। দেখুন মন কি চায় ! মনের বায়নাটা কি ! এইবার মনকে সেই জিনিসটা দিন। ফুল ফল লতা পাতা, সিনেমা থিয়েটার, যাত্রাগান। সব সময় ঘোড়ার মতো টগবগ করুন। লাইফ একটা ফোর্স। তা না আমার বউ, আমার মেয়ে, আমার ছেলে। ঈশ্বর পাঠাবার সময় নিতম্বে একটি লাথি মেরে বলেছিলেন—গো অ্যান্ড এন্‌জয়।'

পলিটিক্যাল নেতার মতো ভদ্রলোক এমন তেজে ওই সব উপদেশ দিলেন, মনটা চমকে উঠল। আরে ম্যাদামারা পান্তাভাতকে রসাতে পারলেই তো পচাই। পচাইকে আর এক ধাপ এগিয়ে দিতে পারলেই চোলাই। রক্তে ঢুকছে যেন চাবুক। অনেক ভেবে দেখলুম আমার ভালবাসার ভাললাগার বস্তুটি হল রোমান্‌স। মাছের মতো সংসারের অগাধ জলে পিঠ ভাসিয়ে চলব। ছেলেকে বসে বসে অঙ্ক করাও, মেয়েকে ইংরেজি পড়াও, আমার ধাতে সহ্য হয় না। নীপাকে স্পেস্যালিস্টের কাছে নিয়ে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা চুপ করে বসে থাক চেম্বারের বাইরে। ওসব আমি পারিনি, পারবো না। যার যা লাইন ! আমার লাইন আলাদা।

খবর পেয়েছিলুম নীপার পরের বোনটা একটু ঝামেলায় পড়েছে। সংসারে যা হয় আর কি ! স্বামীকে পুরোপুরি কব্জা করতে পারেনি। যখন বিয়ে হয়েছিল ছেলেটি তখন সামান্য ছিল। এখন অসামান্য। প্রোমোশান পেতে পেতে এখন টপম্যান। আমি যখন ছেলে পড়িয়ে দিন চালাতুম, তখন আমি পনের টাকা দামের ফুলপ্যান্ট পরতুম। এখন আমি দুশো আড়াইশো টাকা দামের প্যান্ট পরি। স্টন্ডার্ড হাই হয়ে যায় পদমর্যাদা আর রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে। হাই হলে সবই হাই হয়। ভদ্রলোক এখন হাই সোসাইটি ধরে টানাটানি করছেন। দুবার স্বামী পাল্টানো এক তুঙ্গী ভদ্রলোককে তৃতীয় হিসেবে জাপটে ধরেছেন। এই পর্দাকাঁড়া ফ্রী-মিক্‌সিং-এর যুগে দোষের কিছু নয়। আমরা স্বাধীন হয়েছি। ধরাধরি, পাকড়াপাকড়ির এইটুকু স্বাধীনতা ভোগ করা যাবে না ! তা যদি না যায়, তাহলে 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে, কত প্রাণ হল বলিদান'—এ প্রশ্ন তো থেকেই যায়। কি তার উত্তর !

নীপার ওই নিসঙ্গ বোনের প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে। ব্যথিত, ব্যাকুল প্রাণে কে করিবে সান্ত্বনা দান। পারস্পরিক দান। সে ভাল গান গায়, আমি ভাল শ্রোতা। ছেলেবেলা থেকেই আমার ক্ল্যাসিক্যাল কান। তাদের ফার্ণ রোডের ফ্ল্যাটে যাওয়া আসা শুরু হল। জীবনের মানে খুঁজে পেলুম। একেই বলে পরের

জন্যে বাঁচা। কি ছার-স্বার্থ! প্রথম একদিন, দু দিন তেমন পাত্তা পেলুম না। এ তো আর ঘরে ঢোকা নয়, মনে ঢোকা। কংক্রিটের দেয়ালে পেরেকের মতো, আস্তে আস্তে, সইয়ে, সইয়ে ঢুকতে হবে। ধৈর্য হারালে পরোপকার হয় না।

আমার হাতে অজস্র সময়। নিজের বাড়ি হতাশায় ভরা। রাতের আশ্রয় দিবসের কলহকেন্দ্র। যত সরে থাকা যায় ততই ভাল! আমার অফিসের সেই স্টেনো মহিলা ভাড়া বাঁচাবার জন্যে বাড়িঅলাকে বিয়ে করে বসে আছে। মাসে পাঁচশো টাকা, বছরে ছ হাজার টাকা নেট সেভিংস। ভালই করেছে। তবে আগের মতো আর নেই। চেহারায় চেকনাই। চোখে চশমা। ডাঁট বেড়েছে। কথায় কথায় বলে চাকরি ছেড়ে দোব। ছুটির পর একটা মিনিট আর ওভার টাইম করতে চায় না। এই মানসিকতার জন্যেই দেশটা পুরোপুরি বিলেত হতে পারছে না। সত্যিই আমরা ইতিহাস বিমুখ জাতি। কত সহজে অতীত ভুলে যাই। আমার সঙ্গে এত রেস্ট হাউস, গেস্ট হাউসে ঘুরলে, কতদিন আফসোস করলে, আহা আপনার যদি বিয়ে না হত। নিজের বউ সতী-সাবিত্রী হোক, তা বলে পরের বউ কেন হবে! দেশটা এই করেই শুকিয়ে আসছে, প্রাণহীন হয়ে যাচ্ছে। ছেলেবেলায় লুকোচুরি খেলতুম। লুকোচুরির একটা আনন্দ নেই! স্বামী নিয়ে আদিখ্যেতা এ-দেশেই চলে। বিদেশ হলে ছ্যা ছ্যা করত। তবে এটা ঠিক উদ্যোগী পুরুষ বেকার বসে থাকে না। আমি আবার ভাগ্যের চেয়ে পুরুষকারে বেশি বিশ্বাস করি। সামনে একশোটা দরজা, নিরানব্বইটা বন্ধ একটা খোলা। ভাগ্যে একটা খুলবে বলে বসে থাকলে চলবে! একটা একটা করে সব কটা ঠেলতে হবে। এই ঠেলাটাই পুরুষকার।

নীপার বোন দীপা। আমি যখন ওদের বাড়িতে যেতুম বিশেষ কথাটথা বলত না। একটু অহঙ্কার ছিল। রূপের অহঙ্কার, গুণের অহঙ্কার। আমার বিশ্বাস রূপটা একটু কম থাকলে গুণটা আরও ফুটত। প্রভা আত্রে কি কিশোরী আমোনকার, কি শোভা গুরটুর মতো প্রথম সারির গাইয়ে হতে পারত। কাটা আমের ভ্যান ভ্যানে মাছে, ফোটা ফুলে ভোঁ ভোঁ ভ্রমর তাড়াতে তাড়াতে, গর্ভকোষ সামলাতে সামলাতেই যৌবন যায় যায়। যৌবনই তো সাধনার সময়।

ধরা যাক দেহ একটা দুর্গ। বাইরে অবরোধ। থেকে থেকে শালবল্লা ধরাধরি করে তেড়ে আসছে হাজার অবরোধকারী সৈন্য। মারছে ধাক্কা শুল-বসানো সিংহ-দরজায়। কেঁপে কেঁপে উঠছে। এই বুঝি ভেঙে পড়ে। দুর্গঅধিকারী ভেতর থেকে সারাটাক্ষণ ঠেলে আছে। তার তো অন্য কিছু আর করা হবে না। দুর্গ বাঁচাতেই দিন চলে যাবে। সে রাঁধবে কখন, খাবে কখন, নাচবে কখন, গাইবে কখন। দীপা রূপ সামলাতে সামলাতেই দেউলে হয়ে গেল। শেষে যাও

বা একটা কুকুর পুষলে, যদ্দিন তার গলায় চামড়ার বেল্ট ছিল, বেশ ছিল, সে এখন সোনার বকলশ পরে অন্য মালিকের ঘরে ন্যাজ নাড়ছে।

একজন বলেছিলেন, 'ফুলের নেশা ধরান। ফুল ফোটানোর যে কি আনন্দ! জমি নেই তা কি হয়েছে! বারান্দায় টবে টবে গাছ লাগান। পরিচর্যা করুন। বড় সাত্ত্বিক আনন্দ।' মানুষের মনই তো ফুল। আমার নিজের বাগান শুকিয়ে গেছে। তা যাক না। 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' বলে প্রফুল্লর মতো হাহাকার করব কেন। আমি নতুন বাগান করব। করে দেখাব, আমি ঈশ্বরের ফুলবাগানের 'মালী'।

আধুনিক ইলেকট্রনিক গান শোনার যন্ত্রে বহুবিধ কন্ট্রোল থাকে। এটা ঘোরালে ভল্যুম কমে। ওটা ঘোরালে 'ট্রেবল', 'ব্যাস'। সেটা ঘোরালে 'ব্যালেনস'। মানুষের যদি সেরকম থাকত! দীপার অহঙ্কারের ভল্যুম কন্ট্রোল, দীপার মনের ব্যালেনস। অদৃশ্য, কোথাও আছে। সেইটা খুঁজে বের করাটাই তো আমার সাধনা।

মাঝে মাঝে নিজে ভেতর থেকে ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যাই। সেইটা এক সমস্যা। এক আমি আর এক আমিকে প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার করে দেয় □

এক আমি □ কি আছে দীপাতে, যা নেই নীপাতে।

দ্বিতীয় আমি □ কি আছে আমেরিকায়, যা নেই অস্ট্রেলিয়ায়।

এক আমি □ দেশ আর দেহ সমান?

দ্বিতীয় আমি □ সমান। হিমালয়ে আর আলপসে তফাৎ নেই। ছোটনাগপুরের পাহাড় আর আসামের পাহাড় এক হল!

এক আমি □ তোমার অন্য দায়দায়িত্ব আছে।

দ্বিতীয় আমি □ কাদের জন্যে?

এক আমি □ যাদের তুমি টেনেটুনে পৃথিবীতে এনেছ!

দ্বিতীয় আমি □ তারা সব লায়েক দিগগজ। আমার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক 'মানি অ্যান্ড মানি।'

এক আমি □ জীবনের আদর্শ, উদাহরণ এসবের প্রভাব বা মূল্য নেই?

দ্বিতীয় আমি □ সাধুর ছেলে চোর হয় কেন? প্রারব্ধ, সংস্কার। যে যা হবে তা আগে থেকেই ঠিক করা থাকে।

এক আমি □ তুমি তাহলে কে?

দ্বিতীয় আমি □ উপলক্ষ মাত্র। আমি ছুঁয়েছি, ওরা এসেছে। নিজেদের ভাগ্য নিয়ে এসেছে। খেলার মাঠে গোলপোস্ট দেখেছ? তিনটে কাঠ, পেছনে জাল, মাঝে ফাঁক। তাও আবার মাঝ

মাঠে নয়, পড়ে আছে একপাশে। গোলপোস্ট খেলে না। সারা খেলাটাকে খেলায়। সরিয়ে নাও। গোটা খেলাটাই অর্থহীন তামাশা। আমি সংসারের গোলপোস্ট। হিসেব রাখছি, ফরোয়ার্ড লাইনের কে কবার ঢোকালে। হায়েস্ট স্কোরার কে। বুঝলে সোনা! আমি সেই নিষ্ক্রিয় ডিসিসিভ ফ্যাক্টার। আমি নৌকোর তালি মারা পাল। বাতাসটুকু ধরি।

এক আমি □ বাতাসেরও তো কু সু আছে। ঠাকর বলেছেন। গানও শুনেছ কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবুডুবু খেয়ে মরি।

দ্বিতীয় আমি □ ও সব বাতাস মাতাস আমাকে শেখাতে এসো না। সুবাতাস এখন শিশিতে। পালে ধরতে গেলে পাল চুপসে ওই ঘাটেই পড়ে থাকবে। নৌকো আর নড়বে না। হাবুডুবু? হাবুডুবু আর নাকানিচোবানি খাবার জন্যেই তো আসা। সাধু, শয়তান, শেষটা সেই এক। তিনটে খাবি। ধনপতিরও এক পথ, কানাপতিরও একপথ। 'অন্ধ খঞ্জ বধির গলিত কুষ্ঠধারী, কন্দর্প সমান রূপের অধিকারী, সজ্জন তস্কর গৃহী বনচারী, রাজা ও ভিখারী, সমানভাবে হোতা সকলে শয়ান। ভবে কে বলে কদর্য শ্মশান।' শোনো প্রথম আমি, তোমাকে হোরেস ওয়াল পোল শোনাই □ This world is a comedy to those that think, and a bragedy to those that feel. তুমি যাও। গেট আউট। তোমার ভাগবত, পুরাণ নিয়ে সরে পড়। পাঁচ হাজার বছর ধরে, গীতা, উপনিষদ পড়ে একটি মাত্র শিক্ষা হয়েছে, আই অ্যাম আপ, আমি হই উপরে, আই গো ডাউন, আমি যাই নিচে। গেট আউট। তোমার সারমনে আমার প্রয়োজন নেই।

For want of me the world course will not fail,
When all its work is done, the lie shall not,
The truth is great, and shall prevail
When none cares whether it prevail or ~~not~~.

মানুষ হল অহঙ্কারের গাছ। সার বা প্রাণ-রস হল তোষামোদ বা ফ্ল্যাটারি। দীপার ভেতরে শিল্পী হবার অ্যামবিসান ছিল। আসরে আসরে গান গেয়ে

বেড়াবে। দু'পাশে দু'জন তম্বুরা নিয়ে বসবে। মাঝ রাতের দর্শক ঘুম ঘুম চোখে তালি বাজাবে। এতকাল কেউ তাকে ইচ্ছাপূরণে সাহায্য করেনি। দেহ ভোগে ছিল, সে তো মসৃণ চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। মন ছিল উপবাসী। শয়তানদের কায়দাই হল বিষাক্ত মনকে আরও বিষিয়ে তোলা। দীপার বিপথগামী স্বামীর একটা কালো ছবি দীপার সামনে একটু একটু করে ফুটিয়ে তুললুম। মোহটাতো কাটাতে হবে। একটা বাজে, থার্ডক্লাস, চরিত্রহীন লোক, লোভনীয় এক মহিলার মনে আসনজুড়ে বসে থাকবে, ঘোড়ার খাবার ডাব্বায় কুকুরের মতো, নিজেও খাবে না, ঘোড়াকেও খেতে দেবে না, তা তো হয় না। এটা ডেমোক্র্যাসির যুগ। মন থেকে লোকটাকে সবার আগে শিকড়সুদ্ধ তুলে ফেলে দিতে হবে। টবে গাছ করার টেকনিক। একটাকে তুলে ফেলে মাটিতে সারটার দিয়ে রোদ খাইয়ে নতুন চারা বসাও, লকলকিয়ে বেড়ে উঠবে।

আমার এক বন্ধু খুব ধ্যানট্যান করে। ঈশ্বরকে সে ধরবেই। তা সে আমাকে তার সাধনার কথা মাঝে মাঝে বলে। ভাবে আমিও এক সাধক। আমি সব সময় চোখটাকে ঢুলুঢুলু করে রাখি। ছাত্রজীবনে পড়া ফাঁকি দেবার কায়দা। রোগের প্রকাশ লক্ষণটা আগে জেনে নাও, তারপর সেই লক্ষণ ফুটিয়ে তোলো একে একে। জ্বর হলে গা গরম হবে। বগলে রসুন। মাথার যন্ত্রণা। গা বমিবমি। গাঁটে গাঁটে ব্যথা। সাধনার লক্ষণ জানা থাকলে সাধক হতে এক মুহূর্তও সময় লাগে না। ঢুলু ঢুলু চোখ। ঠোঁটে স্বর্গীয় হাসি। ধীরে ধীরে থেমে থেমে কথা। চালচলনে একটা ভেসে ভেসে যাবার ভঙ্গী। 'সখি ধরো ধরো/মালা পরো পরো ' ভাব।

মানুষের কাছ থেকে মানুষ কত কি শিখতে পারে। এক শিক্ষা আর এক শিক্ষায় অন্যভাবে লেগে যায়। ধ্যানের কায়দা হল, স্থির হয়ে বোসো। চোখ বুজোও। ভাবনা। ভাবনার পর ভাবনা। আসতে দাও। এইবার একটাকে অনুসরণ করো। চলো তার পেছন পেছন। ধরা যাক ভাবনায় দীপা এসেছে। চুলে সাদা তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরলো। 'বসুন' বলে ওপাশে গেল। দু টো পা। খোলা হাত। যোগিনীর মতো করে পরা শাড়ি। চুল থেকে তোয়ালে খুলছে। পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে দু'হাত তুলে চুল ঝাড়ছে। মারো লাথি। দীপাকে নয়। দীপার চিন্তাকে। চিন্তার বল চলে গেল মনের মাঠের বাইরে। মন ফাঁকা। এই শূন্যতা হয় তো কয়েক সেকেন্ডের। এইবার হয় তো দীপা আসবে। আসুক। এই শূন্যতার সময়টাকে বাড়াতে পারলেই, মার দিয়া কেল্লা। ঈশ্বরকে দেখা যাবে। দেখা যাবে অলৌকিক দৃশ্য। দীপার মনকে প্রথমে খালি করতে হবে। তার মন যখন হাহা করবে, তখনিই হবে আমার

প্রবেশ।

দীপা কেন, কোনও মেয়েই এখন আর আমার প্রেমে পড়বে না। আজে বাজে কথা বলে মন ভেজাবার ধৈর্য গেছে। ফাইফরমাশ খাটার মুরোদ গেছে। ছোট মতো একটা ভুঁড়ি হয়েছে। দৃষ্টিতে সে উজ্জ্বলতা নেই। কাটগ্লাসে লাল মদের মতো মনের আর সে ঝিলিক নেই। খেলা নষ্ট হয়ে গেলে খেলোয়াড়কে কে চায়!

প্রথম মন □ তাহলে নেচে নেচে মরছ কেন?

দ্বিতীয় মন □ একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো।

প্রথম মন □ নিজের সংসার নিয়ে থাকো।

দ্বিতীয় মন □ কেউ একই জামা দিনের পর দিন পরে! একই ব্র্যান্ডের সাবান বছরের পর বছর মাখে! চেঞ্জ ইজ লাইফ। এক রাজার কতটা রাজত্ব লাগে! অকারণে যুদ্ধ করে মরে কেন? জয় করার আলাদা একটা আনন্দ আছে। বলং বলং বাহুবলং।

প্রথম মন □ নিজের মন জয় করো।

দ্বিতীয় মন □ কারুর বাপের ক্ষমতা আছে মন জয় করে! মনই আমাদের জয় করে। মন ছুটছে বলেই জগৎ ছুটছে।

সংসারে পুরুষের প্রয়োজন আছে। স্বামী তো বিনা মাইনের চাকর। দীপার ফাইফরমাশ খাটার জন্যেও তো একজন লোক চাই। আমি আর আমার গাড়িটা তার সারভিসে লেগে গেল। গ্যাস, ইলেকট্রিক বিল, প্লাম্বার ধরে আনা। কাঠের মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী। তিন ঘন্টা বসে থেকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আনা। দীপার একটি মাত্র ছেলে বাইরে বোর্ডিং-এ থাকে। তাকে টাকা, এটা ওটা পাঠানো। অফিস কেটে দুপুরে দীপার বাড়িতে আসতে বেশ ভাল লাগত। রাধা অত কাণ্ড করে কেন রাতে অভিসারে যেতেন নিজের মন দেখে বুঝেছিলুম। পৃথিবীতে এর চেয়ে ভাল কাজ আর কিছু নেই। বিল্বমঙ্গল সেই কারণে অমর।

সারা পাড়া নিস্তব্ধ। সবাই অফিসে। দোকান পাট বন্ধ। রোদে চারপাশ খাঁ খাঁ করছে। আমার চকোলেট গাড়ি ঢুকছে। দু একটা জানলায় পর্দার আড়ালে কৌতূহলী চোখ। কোনও কোনও ঝুল-বারান্দায় ঢিলঢিলে ম্যাক্সি পরা আদুরে মেয়ে। কোনো কোনো বাড়ির ছায়ায়, দেয়াল ঘেঁষে ঝিয়েদের প্রাণের কথা। আমার চকোলেট গাড়ি এগোচ্ছে। যতটা সম্ভব যুবক সেজে। বিলিতি গন্ধটন্ধ মেখে আমি পেছনের আসনে। আমার পাশে সুদৃশ্য বাক্সে পার্ক স্ট্রীটের প্যাস্ট্রি একটা খাব খাব গন্ধ ছড়াচ্ছে। পেছনে শাড়ির প্যাকেট। আমার চকোলেট গাড়ি

এগোচ্ছে। পাপ করতে যাবার আলাদা একটা স্বাদ আছে যা পুণ্যের পায়েসে নেই। পাপ হল বিরিয়ানী, মুর্গমসল্লম। ওই জন্যেই পাপের জগতের পপুলেশা এত বেশি। ভগবানের চেয়ে শয়তান এত পাওয়ারফুল। শয়তানের কোনও পাবলিসিটি নেই। বেদ নেই, পুরাণ নেই, গীতা নেই, ভাগবত নেই। শয়তানের দুটো 'ম' আছে। সেই দুটো মকে সামলাবার জন্যে, ত্রিশূল, ধুনী, জটা, কৌপীন, পঞ্চতপা, কায়কল্প, গুহা, প্রয়াগ, কুম্ভ ।একেবারে সাজোসাজো রব। দুটো ম। ম এ একটা সামান্য আকার, সেই আকারটিকে লাগাবার জন্যে এত হাহাকার। কেউ প্রায় লাগিয়ে ফেলেছে, ম প্রায় মা হয় আর কি, এমন সময় সব হড়কে গেল। জীবনের সিংহভাগ ব্যাচেলার থেকে বুড়ো বিয়ে করে বসল এক বুড়ীকে। 'বড় লোনলি ফিল করছিলুম ভাই।' দিন কতক কলপটলপ লাগিয়ে, আমার মিসেস, আমার মিসেস করে খুব আদিখ্যেতা। ঠোঁটে বাঁকা সিগারেট, বাজারে গিয়ে মাছওয়ালাকে শোনান, 'আর কি, আর কাটা পোনা নয়, তোলো পারসে, লাগাও ট্যাংরা, বেটার হাফ এসে গেছেন। বুঝলে মদন, এতদিন মরে ছিলুম। রান্নার যা হাত না !' উত্তেজনায় মদনকেই নেমন্তন্ন করে বসল, 'এসো না একদিন খেয়ে যাবে, কালিয়া, পোলাও নয়, স্রেফ চুনো মাছের বাটি চচ্চড়ি, ঝিংয়ে পোস্ত, সরষে করলা।' ছুটলো বন্ধু ডাক্তারের কাছে, 'হরমোন, মরমোন ফোঁড়ো দেখি। একটু স্ট্রেংথ চাই।'

ভাগ্যিস শয়তান ছিল, তা না হলে ভগবানের রাজত্ব তো লাটে উঠত। জটাজুটধারী কিছু চরিত্র, উলঙ্গ, অর্ধোলঙ্গ, জবাফুলের মতো চোখ। কিছু জিজ্ঞেস করলেই গাল ফুলিয়ে হয় বোম্ না হয় ওম। কেউ মড়ার মাথা নিয়ে নাচছেন, কেউ চিমটে বাজাচ্ছেন, কেউ নিম্নাঙ্গে শিকল ঝোলাচ্ছেন, কেউ সারাদিন শুধু সাঁ সাঁ করে শ্বাস টানছেন। জাগো কুণ্ডলিনী, জাগো কুণ্ডলিনী করতে করতে চোখ কপালে। শেষ। তিনি শেষ, তাঁর জেনারেশান শেষ। পড়ে রইল চিমটে, কমণ্ডুল, রুদ্রাক্ষের মালা, এক জোড়া কাষ্ঠ পাদুকা।

শয়তান অনেক সহজ সরল। তার লাখ লাখ টাকার মন্দির লাগে না। চার্চের প্রয়োজন হয় না। মন মন ঘি, গ্যালন গ্যালন দুধ দরকার হয় না। তার মাথায় টন টন ফুল চড়াতে হয় না। পটাপট পাত ছিঁড়ে গোটা একটা বেলগাছকে ন্যাড়া করতে হয় না। তার ভজনার জন্যে মাথাটিকে কামিয়ে বেল করতে হয় না। গলায় লক্ষ গণ্ডা মালা ঝুলিয়ে, ভারে কুঁজো হয়ে বাবা রে মা রে করতে হয় না। শয়তান খুব সিম্পল। ঈশ্বরের মতো কম্প্লিকেটেড নয়। একটা গাছ, একটু ছায়া, ঘাসে ঢাকা একফালি জমি, একটি নারী, একটি পুরুষ। একটি নির্জন ছাত, একটু চাঁদের আলো, একটা জলের ট্যাঙ্কের সামান্য আড়াল, অথবা একটি চিলে কোঠা,

একটি নারী একটি পুরুষ। শয়তান এই সব সামান্য উপাদান দিয়ে কি সব বড় বড় কাজ করে ফেলে ভাবা যায় না। দর্শন তো শয়তানের। ভগবানের না কি! নাকানি চোবানি খাবার পরই মানুষের চিন্তা খোলে—তখন ব্রহ্মাণ্ডের খোঁজ পড়ে। প্রশ্ন আসে—কে খেলায় আমি খেলিবা কেন। 'ওগো আমার গাঁটে গাঁটে ব্যথা গো' বলে বুড়ি যখন ককিয়ে ওঠে তখন হটব্যাগে জল ভরতে ভরতে বুড়ো ভাবে, কোথায় আমার সেই চাঁদিনী রাত। ঝাউয়ের শন শন, সমুদ্রের ঢেউ। গেম ইজ নট ওয়ার্থ দি ক্যাণ্ডল। আর বুড়ো যখন মশারির ভেতর বসে হাঁপানির শ্বাস টানে আর বুড়ি তার বুক চেপে ধরে রাত জাগে তখন ভাবে, এ আবার কি ফুলশয্যা। তখনই ঈশ্বরকে মনে পড়ে। 'ঠাকুর এই কষ্টের চেয়ে আমাকে বিধবা করো।'

আমার চকোলেট গাড়ি অভিসারে চলেছে। পুড়ছে কম্পানির তেল। আমি মনে মনে প্যাকেটের শাড়িটার কথা ভাবছি। খাঁটি সিল্ক। সারা গায়ে নীল আর হাল্কা নীলের ডিজাইন। দীপার ফর্সা শরীর যখন ওই মোড়কে ঢুকবে আমার তখন মরে যাবার মতো অবস্থা হবে। দীপা হল ফুলদানি, আর নীপা হল পূর্ণকুম্ভ। দীপা নীপার চেয়ে উচ্চতায় সামান্য খাটো, কিন্তু নরম তুলতুলে। নীপা স্বভাবে মুরগী। খরখর্ খরখর্ করে বেড়ায়। ডানা ঝাপটায়। দীপা হল রাজহংসী। একটা গানের লাইন মনে পড়ছে, তারা তুমি কত রূপ জান ধরিতে। ওইটাকেই ঘুরিয়ে নি, নারী তুমি কত রূপ জান ধরিতে। নীপার শাড়ি নীপা নিজেই কেনে। আমার না কি পছন্দ নেই। বহুকাল পরে একটা শাড়ি কিনলুম। কিনতে কিনতেই রোমান্টিক হয়ে উঠছিলুম। কলকাতার চড়া রোদ চাঁদের আলো হয়ে গেল। চারপাশের প্যাঁ পোঁ যেন বেঠোভেনের কনসার্ট। সত্যিই তাই, মনেই মথুরা।

দীপাদের বাড়িটা কি ঠাণ্ডা। কোথাও কোনও উত্তেজনা নেই। দীপা স্বভাবে নীপার উল্টো। গোছানে। বাড়িটাকে একেবারে ছবির মতো করে রেখেছে। বেল টিপতেই দরজা খুলে দিল ওদের কাজের মেয়েছেলেটি। ওকে দেখলেই আমার সেই মহিলাকে মনে পড়ে, যার আশ্রয়ে আমার মাসখানেক বস্তিবাস হয়েছিল। অবিকল সেই রকম দেখতে। ঘুস-ঘাস দিয়ে একে আমি হাত করে ফেলেছি। বেশ পটে গেছে। রতনে রতন চেনে, ভাল্লুকে চেনে শাঁকালু। দরজা খুলেই, দু' হাত মাথার ওপর তুলে উঁউঁ করে আড়ামোড়া ভেঙে, দরজার একটা পাল্লায় এলিয়ে পড়ে হাই তুলল। একটা চোখ সামান্য বুজে শরীরের এমন একটা ভঙ্গী করল যেন আমি তেল পুড়িয়ে ওর জন্যেই এসেছি। অদ্ভুত একটা হাসি মুখে। আজও ওর জন্যে ঘুস আছে। লোভীকে আরও লোভী করে তুলতে

পারলে হাতের মুঠোয় এসে যায়।

পাশ দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় ও ইচ্ছে করেই বেশি জায়গা ছাড়ল না। যাতে ওকে ঠেলেই ঢুকতে হয়। দরজাটা বন্ধ করে দিল। দিবানিদ্রা দিয়ে উঠেছে। আজকে যেন বেশি আদুরে। এমন একটা ভাব করছে, ও যেন আমার সদ্য বিয়ে-করা বউ। খারাপ অবশ্য লাগছে না। ওর হাব-ভাব আমার যে জায়গায় নাড়া দিচ্ছে, সেখানে রুটি লুচি, মানে রুচি, শিক্ষা, সংস্কৃতি এসবের কোনও প্রভাব নেই। সে একটা অদ্ভুত ওপ্‌ন ল্যান্ড, নো ম্যানস ল্যান্ড। বড় ঝামেলার জায়গা। পাপের জন্মভূমি।

Blood hound in front of my heart
'Watching over my fire
You that feed on bitter Kidneys
In the Suburb of my misery

দরজাটা বন্ধ হতেই ঢোকার মুখটা অন্ধকারমতো হয়ে গেল। এক দেয়ালে একটা মুখোশ আর এক দেয়ালে একটা ঘোড়ার ছবি। ছবিটা যেদিকে সেদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। ঘুমের আলস্য কাটেনি। দুপুরে চান করেছিল। পিঠের দিকে ছড়িয়ে আছে ফুরফুরে চুল। এর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে দীপাও ঘুমোচ্ছে। পাখা ঘোরার শনশন আওয়াজ।

মেয়েটি আবার হাই তুলে আড়ামোড়া ভাঙল। এত হাই উঠছে কেন? পিঠের দিক থেকে একগুছি চুল সামনে এনে দু আঙুলে ইলিবিলি করতে করতে বললে, 'তুমি বলেছিলে, 'এই দ্যাখো আজ শ্যাম্পু করেছি। কি সুন্দর গন্ধ! একেবারে হালকা, ফুরফুরে।'

আমার নাকটাকে তার চুলের কাছে নিয়ে গিয়ে, সন্তুষ্ট করার জন্যে, আ করে শব্দ করলুম।

সে বললে, 'এই দ্যাখো, তুমি বলেছিলে, ফর্সা জামাকাপড়। সব ফর্সা।'

কোথা থেকে যে এত খাটো ব্লাউজ যোগাড় করে। শরীরের সঙ্গে একেবারে সেঁটে আছে। দেয়ালে ঠেসান দিয়ে পা দুটো সামনে এগিয়ে দিয়ে সব এলোমেলো করে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একেই বলে মহাপাপ। এর সাহস দেখে মনে হচ্ছে, দীপা গভীর ঘুমে। দীপা ঘুমকাতুরে, নীপা ইনসমনিয়ার রুগি। আমারও একটা হাই উঠল। আড়ামোড়া ভাঙতে ইচ্ছে করল। ভাবছি, এলুম কার কাছে পড়ে গেলুম কার হাতে। এদের বয়েস বোঝা যায় না। মানুষের লালসার কারবাইডে কাঁচাতেই পেকে বসে থাকে। তবে কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যেই আছে। এ বাড়ির আদরে আর ভোগে দেহত্বকে চেকনাই। চোখ দুটো

একটু ছোট-ছোট হলেও ছুঁচের মত দৃষ্টি। তুলসীদাসজী ঠিকই বলেছিলেন— লালচ বুড়ি বলাই।

মেয়েটি ওই অবস্থায় হাঁটু নাচাচ্ছে। ভরাট শরীরে ঢেউ খেলছে। সে বললে, 'এই দ্যাখো, ভেতরের জামাও পরিষ্কার।'

আমাকে নাচাচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছি খুব শিক্ষিত হাতে আমাকে খেলাচ্ছে।

Blood hound in front of my heart
With the wet flame of your tongue lick
The Salt of my Sweat
The Sugar of my death.

যে পাপ করব না ভেবেছিলুম। ছবিতে 'প্র্যানসিং হর্স', পেছনে মুখোশ। মেয়েটি আদুরে গলায় বললে, 'কি হচ্ছে কি ছাড়ো। তোমার আর কি! তুমি তো আর শেষ পর্যন্ত যাবে না।'

কোথাও আমি শেষ পর্যন্ত যাই না। আমার স্বভাবে নেই। আমি শুরু করি শেষ করি না। কোনও কিছুতেই আমার তৃপ্তি নেই। চাকরিটা ভালই ধরলুম। অনেক দূর যাওয়া যেত। 'ধ্যার' বলে যেখানে ধরেছিলুম সেইখানেই রয়ে গেলুম। কি হবে ওপরে উঠে! কয়েক শো টাকা মাইনে বাড়বে, দায়িত্ব বেড়ে যাবে হাজার গুণ। সংসার করার জন্যে চোখা একটা মেয়ে ধরলুম। সে বাঁধনও শিথিল হয়ে গেল। ভাল খেলতে পারলুম না। ড্রিবলিং জানি না, ডজিং জানি না, ভুল পাস। গোলে বল মারি পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সবেতেই অদ্ভুত একটা আলস্য। 'যা হয় হবে,' এই রকম একটা ভাব।

মেয়েটি বললে, 'মনে করো আমি হেমা মালিনী, তুমি ধর্মেন্দ্র।'

আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলুম, 'দীপা কোথায়?'

মেয়েটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললে, 'তুমি আমাকে হাতের ওপর শুইয়ে ও-ঘরে নিয়ে যেতে পারবে!'

'দীপা কোথায়?'

'তোমার ক্ষমতায় কুলোবে না। দেখবে আমার ক্ষমতা!'

আমি বাধা দেবার আগেই ঝট করে আমাকে মেঝে থেকে তুলে নিল। তার আঁচলে আমার মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। দীপার শোবার ঘরের দিকে এগোচ্ছে। ভয়ে আমার সব কুঁকড়ে গেছে। এ কি পাগলামি। এ কি কোনও ফাঁদ!

'দীপা কোথায়!'

'তুমি খুব একটা ভারি নও।'

'আরে দীপা কোথায় !'

পর্দা ঠেলে দীপার ঘরে ঢুকে পড়ল। ছেলেবেলা হলে ওই অবস্থায় হাত পা ছুঁড়তুম। এখন তো মনে হচ্ছে আমার হাত-পা নেই। শুধু হৃদয়টা আছে। ধড়াক ধড়াক করে লাফাচ্ছে। গোয়েলের সঙ্গে প্রথম যেদিন ওই পাড়ায় গিয়েছিলুম তখনও আমার ভেতরটা এই রকম ব্যাঙের মতো লাফাচ্ছিল। ঘরের বিছানায় দীপা আছে ভেবে ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলেছি। আবার আমার সেই ভাব, যা হয় হবে। শনশন পাখা ঘুরছে। দেয়াল ক্যালেন্ডার খ্যাচ-খ্যাচ করছে। মেয়েটার গায়ে কি শক্তি। আমি যেন শোলার পুতুল। ফোমের বিছানার ওপর ঝপাত করে ফেলে দিল। আমার শরীর নাচতে লাগল। ভেবেছিলুম ঘুমন্ত দীপার ঘাড়ে ফেলছে। বিছানা ফাঁকা। আর কিছু বোঝার আগে মেয়েটা আমার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আকাশ অন্ধকার। এক রাশ চুল, শক্ত ঘাড়, নরম বুক, গভীর নিঃশ্বাস।

'দীপা কোথায় ?'

'দীপা-দীপা কোরো না। আমিই দীপা। চিনতে পারছ না আমাকে ! এই বাড়ি আমার, এই বিছানা আমার।'

এইবার আমি বললুম, 'কি হচ্ছে কি ! দীপা।'

'তোমার দীপা সিনেমা দেখতে গেছে। আজ দেখব তোমার কেমন ক্ষমতা !'

'তুমি জর্দা খেয়েছ ?'

মেয়েটা আমার নাকের কাছে হা করল। যেই অমন করল, আমার গেঁতিয়ে-পড়া ভাবটা নিমেষে কেটে গেল। মনে হল, যা হয় হবে ! খিলখিল হাসি। বিছানার চাদর লণ্ডভণ্ড। বালিশ-টালিশ সব ছিটকে মেঝেতে। আমি অসহায়। আমাকে ধরেছে। পাখা চলছে, তবু কি গরম। সব খেলাতেই হেরেছি। এ খেলাতেও হারব। আমাকে শেষ করে দিলে। এক লাথি। গড়িয়ে মেঝেতে।

'ঢেঁকি !'

খাটে শুয়ে আছে। ঝুলছে ঘাম চকচকে মুখ। কি সাহস, দীপার বিছানায় শুয়ে আছে। দীপাও বোধহয় এমন সম্রাজ্ঞীর মতো শোয় না। আঙুল নেড়ে আদেশের সুরে বললে, উঠে এস। আমার কুকুর ন্যাজ নাড়ল। যার ভেতরটা যত কুকুর সে তত সুখী। প্রভুরা কুকুর ভালবাসে। তিনি চাকরিদাতা হতে পারেন। প্রেমিকা হতে পারে। স্ত্রী হতে পারে। এমন কি বৃদ্ধের রোজগারী সন্তান হতে পারে।

'তুমি আগে কোনওদিন এই বিছানায় শুয়েছ !'

'কতবার।'

'তোমার এখানে দাগ? পেট চিরেছিল?'

'ছেলে।'

'কোথায়?'

'যমের বাড়ি।'

'এই বিছানায় শুতে ভয় করে না?'

'ভয় ভাঙিয়ে দিয়েছে।'

'কে?'

'এ-বাড়ির বাবু।'

মেয়েটা ফুলে-ফুলে হাসছে। হাসতে হাসতে মাতালের গলায় বললে, 'সব শালা শয়তান।'

'তাই না কি?'

'তুমি কি? তোমার তো বউ আছে, শালীর পেছনে ঘুরছ কেন? তিনটে তো পেছনে পেছনে ঘুরছে কুত্তার মতো। তুমি হলে চার।'

আমার চকোলেট রঙের গাড়ি পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রায় সন্ধে। পার্কে বাচ্চারা খেলছে। আয়ারা প্যারাম্বুলেটার ঠেলছে। এরা বড় হবে। বড় হয়ে কুকুর হবে। কর্মদাতার। স্ত্রীর। মেয়েছেলের। প্রবৃত্তির। পৃথিবীতে মানুষের প্রতিটি মুহূর্ত হল মৃত্যু। হঠাৎ বুকটা ছাঁত করে উঠল। সর্বনাশ! আমার পইতেটা দীপার বিছানায় মাথার বালিশের পাশে খোলা পড়ে আছে। পরতে ভুলে গেছি।

আমি □ নিশ্চয় ও তুলবে।

সংশয় □ যদি না তোলে।

আমি □ বিছানা গোছগাছ করবে না!

সংশয় □ ওপর-ওপর করবে। যদি 'মিস' করে!

আমি □ আবার গাড়ি ঘোরাব!

সংশয় □ এতক্ষণে ফিরে এসেছে দীপা।

আমি □ তা হলে যা হয় হবে।

আমার চকোলেট রঙের গাড়ি, সন্ধের রাজপথ ধরে ছুটছে। জীবনটাকে নিজের দোষে কি করে ফেললুম! সুস্থ জীবন থেকে কত দূরে সরে এসেছি। ছেলে, মেয়ে বাবা বলে না, বেশ করে। আমি হলে এমন বাবাকে আমিও বাবা বলতুম না। 'দেখাই যাক না কি হয়'—এই যে আমার ভাবটা, এই ভাবটাই আমার সর্বনাশের কারণ।

আজকাল নীপা আমার দিকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকালেই ভয় করে। আমার ভেতরটা দেখে ফেলছে না তো ! আমার শরীরটা কাঁচ হয়ে যায়নি তো ! সে রাতে দুটো চিন্তা আমাকে অস্থির করে তুললে, দীপার বিছানা থেকে আমার লাশ বেরোয়নি তো ! পইতে। শুয়ে সবে বালিশটা সরিয়েছি। এটা কি ? হ্যাঁ রে এটা কি !

জানি না তো দিদিমণি।

পইতে ! কার পইতে ! কোথা থেকে এল পইতে !

তিনজন ঘুরছে। কে কে ! সব ফলই কি কাকে ঠোকরাবে ! একটা জায়গাও ফাঁকা থাকবে না ! প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই ভাবে বাড়লে বাঁচা যায়। বাতাসা আর পিপড়ে !

চোখ বোজালেই একটা দেহ ভেসে উঠছে। তলপেটে লম্বা একটা কাটার দাগ। ছেলে। ছেলে কোথায় ! যমের বাড়ি। দীপার ছেলে ? দূরে মানুষ হচ্ছে। তিনটে নেকড়ে থাবা গেড়ে বসে আছে। সকলের সামনেই একটা করে ব্লাড হাউন্ড। নীপার গায়ে হাত রাখলুম। আজ খুব ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। নীপা হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'সংযত হবার বয়েস হয়েছে। অভ্যাসের দাস নাই বা হলে !' এই হয়। গোয়ালে যার শুকনো গরু তার ভরসা ডেয়ারি। সাধে মানুষ বাইরে ছোটে ! এই তো আমার পাপের সমর্থনে যুক্তি পেয়েছি। নীপা এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে না গেলে, সে যদি আগের মতো দাতা থাকত তা হলে আমাকে আর এই ভাবে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে এর ওর দ্বারে ঘুরতে হত না।

ইস পইতেটা গলা থেকে খুলে চলে গেল ! ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন। পইতের সময় কত ঘটা হয়েছিল। আমার সেই ব্রহ্মচারীর বেশ দেখে তখন গুরুজনরা বলেছিলেন, 'আঃ, কি রূপ খুলেছে ! এ মনে হয় সন্ন্যাসী হবার জন্যেই জন্মেছে। নিত্য সন্ধ্যাহ্নিকটা ছেড় না। এই যে ধরলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চালিয়ে যেও।' সন্ধ্যাহ্নিক ! পইতেটাই খুলে জড়িয়ে রয়ে গেল একটা অসভ্য মেয়েছেলের গোদাপায়ে।

আমি □ অ, এখন হয়ে গেল অসভ্য। তখন তো ওই গোদাপায়ে গড় করছিলে।

দ্বিতীয় আমি □ ন্যাবায় মানুষ সব হলুদ দেখে। বন্যায় খাল বিল ডোবা সব এক হয়ে যায়। কে খাল, কে ডোবা, কে পদ্মপুকুর বোঝা যায় না।

সারাটা রাত, এই ভাবে কেটে গেল। একটু তন্দ্রা, তালগোল পাকানো চিন্তা, বিশ্রী স্বপ্ন। ভোরের দিকে মনে হল, নাঃ যে ভাবেই হোক, এই তিন-চার রকমের জীবন ছেড়ে এক রকম জীবন যাপন করতে হবে ! নিজেকে নিয়ে নির্জনে বসে

বিচার করতে হবে। যেই মনে হচ্ছে, সব মায়া, জগৎ মায়া, স্ত্রী মায়া, পুত্র-কন্যা মায়া, মন ধর্মের দিকে, ত্যাগের দিকে না ছুটে, ছুটছে ভোগের দিকে, অধর্মের দিকে। এই বাড়ির মেঝে-টেঝে যে মিস্ত্রী করেছিল, সেই মিস্ত্রীই মনে হয় আমার মন তৈরি করেছিল, তা না হলে এমন চালের গোলমাল হয়! জল চলেছে নর্দমার উল্টো দিকে। জ্ঞানের ঝেঁটা চালাতে হবে।

শিষ্য □ সংসারে সার বস্তু কি?

গুরু □ সব রকম বিচার করে দেখা গেল, সার বস্তু, তত্ত্বজ্ঞান। নিজের আর পরের ভাল যে করে সে-ই সারপদার্থ নিয়ে জন্মেছে।

তাহলে আমি দীপার ভাল করার জন্যে আদা জল খেয়ে লাগব। পারলে ওই মেয়েটারও ভাল করব। আহা, বেচারার যৌবন কি এইভাবেই খোলা পাত্রে দুধের মতো শুকিয়ে যেতে দেওয়া উচিত হবে কি গুরু। ওর স্বপ্ন আছে। স্বপ্ন তৈরির মালমশলা আছে। স্বপরহিতায়োদ্যতং জন্ম।

নীপা, নিজের পুত্রকন্যা এদের হিত করব না?

না, ওরা আবার পর হল কবে? ও তো তোমার সংসার। নিজের সংসার না ভাসালে পরের উপকার হয়! ইতিহাস ভুলো না।

উপকার মানে, লোভ দেখিয়ে নিজের ভোগে আনা?

তা কেন? ওদেরও জ্ঞানোদয়ের চেষ্টা করা। জ্ঞান এলেই কর্তব্যের বোধ আসবে। কর্তব্য কি? যে কাজ করলে সংসারপাশ ছিন্ন হয়। নিজের সংসারপাশ প্রায় ছিন্ন হয়ে এসেছে। এইবার একটা হ্যাঁচকাটানের অপেক্ষা। দীপারও ছিন্ন হয়ে এসেছে। ওদিকেও এক হ্যাঁচকা। তারপর এই যে, এই প্রশ্নোত্তর।

শিষ্য ঃ মদিরের মোহজনকঃ কঃ? মদিরার ন্যায় মোহ উৎপাদন করে কোন বস্তু?

গুরু ঃ স্নেহ। স্নেহের বশীভূত হয়ে পুত্র-কলত্রাদির ভরণপোষণের জন্যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হওয়া। একেই বলে স্নেহমদিরায় বিমোহিত হওয়া।

শিষ্য ঃ নরক কাকে বলে। কো নরকঃ?

গুরু ঃ পরাধীনতাই নরক।

আমি নীপার অধীন নই, স্ত্রী পুত্র, সংসার কারুর অধীন নই আর স্নেহমদিরার বশীভূত নই। আমি স্বর্গীয় পুরুষ। দেবদূত। আমি ওদেরও দলে টেনে দেব-দেবী নৃত্য শুরু করে দোব। দেখিয়ে দোব, সংসারে জ্ঞানীদের কি ভাবে বাঁচা উচিত।

শিষ্য ঃ অহর্নিশ কি চিন্তা করব? কাহর্নিশমনুচিন্ত্যা?

গুরু ঃ সংসারাসারতা ন তু প্রমদা। সব সময় ভাববে সংসার অসার। অসার

এই সংসার ; কিন্তু নারীচিন্তা করবে না।

শিষ্য ঃ অ্যাঁ। তাহলে সংসারে আর রইল কি ? গুরুদেব এখন তবে থাক। আবার পরে হবে।

না না, শুরু যখন হয়েছে আর একটু শুনে যাও। প্রকৃত বীর কে বল তো ? রমণীর নয়নবাণে যে জর্জরিত হয় না। আর সংসারে দুর্বোধ্য কি ? কিংগহনং ? স্ত্রী চরিতং।

মাঝে মাঝেই নীপা বলত, টাকা পয়সা চুরি হচ্ছে। যেখানেই রাখছে, সেখান থেকে সরে যাচ্ছে। মেয়ে আর ছেলে দু'জনকেই সন্দেহ। আমাকে সন্দেহ করে না। অবশ্য অনেক স্বামীই স্ত্রীর পয়সা সরায়। খুব দায়ে না পড়লে সরায় না। আমি বলেছিলুম, মেয়েকে সন্দেহ কোরো না। মেয়েরা ছেলেদের পয়সায় ওড়ে। দেখ, এই মেয়ের জন্যে কোন বাড়িতে, কোন ছেলে তবিল ফাঁক করছে। সন্দেহ করতে হলে ছেলেকে করো। সে এখন কটা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে কে জানে ?

হঠাৎ নীপা আবিষ্কার করল শুধু পয়সা নয় তার কিছু কিছু গয়নাও হাওয়া হয়ে গেছে। আমার আর এই সব অশান্তি ভাল লাগে না। গেছে যাক না। সাবধানে না রাখলেই যাবে। দেখছে সংসার বলে আর আমাদের কিছু নেই। এটা একটা সরাইখানা। মেহেমানদের রাতের আশ্রয়স্থল। এক এক জন, এক এক ঘরের অধিবাসী। একটা কমন সার্ভিস চালু আছে মাত্র। তাই উনুনে আগুন পড়ে। রান্নার ছ্যাঁকছোঁক শব্দ ওঠে। খবরের কাগজ আসে। ধোপা এসে জামাকাপড় নিয়ে যায়। সংসার বলে কিছু নেই।

একটা হার। হারটা পরশুও ছিল, আজ নেই। কেন নেই, কে নিলে ?

পেছন থেকে নীপার খোলা কাঁধে হাত রাখলুম। ঠাণ্ডা। মসৃণ। এখনও তেমন বুড়ি হয়নি। শেষ বেলার পশ্চিম আকাশ। সূর্য নেমে গেছে। আকাশের মুখে শেষ চুম্বনের রক্তিমাভাস। চুল কেটে না ফেললে ঘাড়টা আরও সুন্দর দেখাত। নীপা সব সময় ভালো ভালো শাড়ি পরে থাকে। দীপার উলটো। দীপা সব ব্যাপারেই বেশ কৃপণ।

নীপা বললে, 'আর না, আজ আমি দুটোকেই শেষ করব। আজ আমার একদিন, কি ওদের একদিন।'

নীপা বসে ছিল। মাথার ওপর দিয়ে ঝুঁকে, ওর কপাল, ভুরু, নাক দেখতে দেখতে আমি বললুম, 'তোমার শরীর ভাল না, কেন উত্তেজিত হচ্ছ।'

'পরব বলে লকার থেকে বের করে আনলুম। হারটা ডানা মেলে উড়ে যাবে'—'দ্যাখো, তোমার তো ভুলো মন, কোথায় রাখতে কোথায় রেখেছ।'

'গয়নার ব্যাপারে আমার ভুল হয় না। আমার গয়না বেচে বাবুরা নেশাভাঙ

করবে, প্রেমিক প্রেমিকা খেলাবে, তা আমি হতে দোব না।'

'আর অশান্তি কোরো না। একটা চুক্তি করে, আপোস করে, রফা করে, আমরা মোটামুটি বেশ শান্তিতেই আছি, গত কয়েক মাস। বেশ ভালই বেঁচে আছি। খাচ্ছিদাচ্ছি, অফিস করছি।'

'একে বাঁচা বলে না, এর নাম মৃত্যু। তুমি যাকে শান্তি বলছ, তার চেয়ে বড় অশান্তি আর কিছু নেই।'

'তোমার গয়না আমি আবার গড়িয়ে দোব।'

'তা বলে অত ভরি সোনার একটা হার কোথায় গেল আমি খোঁজ নোব না! আশ্চর্য কথা। এ আপোসে আমার দরকার নেই, এ চুক্তি আমি মানি না।'

খোঁদল টুলে বসেছিল নীপা। আগের চেয়ে শরীরটা বেশ ভারি হয়েছে। কোমরে ভাঁজ পড়েছে। আগে মুঠোয় ধরা যেত নাচের শরীর। নিতম্বে মেদ জমেছে। মেয়েরা রেগে গেলে বিশ্রী লাগে। মেয়েরা সব সময় কেমন সুললিত থাকবে। কবিতা গদ্য হয়ে গেলে ভাল লাগে।

নীপা উঠে পড়ল। নেকড়ে বাঘিনীর মতো এগোতে লাগল ছেলের ঘরের দিকে। দেখে এসেছি তার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। সকালে কখন বিছানা ছাড়বে ঠিক নেই। নীপা দরজা ঠেলছে। ধাক্কা মারছে। আমি জানি কোনও কিছু খোলাতে চাইলে, যদি না খোলে ভীষণ রাগ হয়। জেদ চেপে যায়। সে ঘরের দরজাই হোক আর হৃদয়ের দরজাই হোক।

পেছনে, দূর থেকে আমি বললুম, 'ছেড়ে দাও। যখন উঠবে উঠবে। তোমার হাতে লেগে যাবে।'

'কি বলছ কি, এই ধাক্কায় মরা মানুষও জেগে উঠবে। আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

'কি সন্দেহ। হয় জেগে ঘুমোচ্ছে, নয় মরে গেছে।'

বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। একটা ইয়াং ছেলের স্ট্রোক হবে। জেগেই আছে। ইচ্ছে করে সাড়া দিচ্ছে না। পরীক্ষা করে দেখি। গালাগাল দি। ও গালাগাল সহ্য করতে পারে না। আগেও দেখেছি। গালাগালের খোঁচায় খাটিয়ার ছারপোকার মতো বেরিয়ে আসবে। বেশ ব্যাঙ্গের সুরে বললুম, 'এই যে নবাব, দরজা খোল, বাপের হোটেলে আর কত নবাবী করবে।' আরও সব কাটা কাটা কথা লঙ্কাবাটার মতো লাগিয়ে গেলুম। কিছুই হল না।

মনটা ব্লটিং পেপারের মতো খসখসে সাদা। নীপা বসে পড়ে দরজায় মাথা ঠেকিয়ে ভয়ে কেমন হয়ে গেছে। মেয়েটা বেরিয়ে এসেছে দরজা খুলে। গায়ে ফিনফিনে রাতের পোশাক। ওর লজ্জা না থাকলেও আমার লজ্জা করছে। অসহ্য যৌবন। যেখানে দাঁড়াবে সেখানে আগুন ধরে যাবে। হঠাৎ

প্রতিবেশীদের কথা মনে পড়ল। এই সব শব্দটব্দ শুনে ছুটে না আসে ভিড় করে। এমনি কারুর সঙ্গে কারুর মুখ দেখাদেখি নেই : কিন্তু যেখানে স্ক্যাণ্ডেলের গন্ধ সেখানে প্রথা ভেঙে যায়।

নীপা শ্রান্ত, অবসন্ন, তবুও আমি তাকে সাবধান করলুম, 'চিৎকার কোরো না।'

অবাক হয়ে তাকাল। চোখে জল আসছে। দরজাটা ভাঙতেই হবে। এখন দরজা জানলার দাম অনেক। এমন ভাবে ভাঙতে হবে, শব্দ হবে না, বেশি চোট হবে না। একটা খন্তি নিয়ে এলুম। ওপরে আর নিচে ছিটকিনি। পনের মিনিটের চেষ্টায় দরজা খুলে গেল। মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। পাখা ঘুরছে ফুলস্পিডে। একটা হাত মুঠো করা, আর একটা হাত খোলা। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। মুখটা ঠিক খ্রাইস্টের মতো। ফর্সা টকটকে রঙ। কুমারী মায়েরই সন্তান বলা চলে। ও যখন মায়ের পেটে তিন মাসের, তখন নীপার সঙ্গে আমার রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছি, বুক ওঠা নামা করছে কি না। করছে না। স্থির। সর্বনাশ করেছে। নীপা ছুটে গেল।

আমি বললুম, 'সাবধান। পুলিস আসবে। পুলিসের কথা মনে রেখো।'

গীতা বলছেন, শোকে দুঃখে যিনি অবিচল থাকেন তাকেই আমি বলি স্থিতপ্রজ্ঞ। ডেফিনিটলি আমি স্থিতপ্রজ্ঞ। এই রকম একটা অবস্থায় আমি পুলিসের কথা ভাবতে পারছি। বুকে মোচড় মেরে চোখে জল আসছে না। এমন কি মেয়েকে সোজাসুজি নয়, ঘুরিয়ে বলছি, 'একটা কিছু পরে এলে হয় না, এখুনি বাড়ি লোকে ভরে যাবে।' যেন সব ডিনার খেতে আসবে। আবার এও ভাবছি, অনেক দিন পরে আজ একটা জায়গায় যাব ভেবেছিলুম, সব পণ্ড হয়ে গেল।

হাতের মুঠো থেকে কাগজের একটা পুরিয়া বেরলো। নীপা কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'খুলে দেখ তো।'

পুরিয়াটা প্রথমে টিপে দেখলুম। কি একটা রয়েছে ভেতরে। ভয় হচ্ছিল খুলতে। আমার খোলা উচিত কি না তাও ভাবলুম। শেষে সাবধানে খুলে ফেললুম। চমকে উঠলুম। যেন আমার মৃতদেহ দেখছি। আমার সেই পইতেটা। কোথা থেকে এল, কিভাবে এল। মেয়েটা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন করলে, 'কি এটা ?'

'পইতে।'

'কার পইতে। ওর হাতে এল কি করে।'

পাশ থেকে উঁকি মেরে পড়তে লাগল, ছেলের লেখা, জীবনের শেষ কটা

লাইন।

বাবা, তোমার পইতে। তোমার পরিচয়ে আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করল না। পার তো জীবনের ধারাটা বদলাও। এখনও সময় আছে।

ঠাণ্ডা একটা স্রোত, পা থেকে মাথার দিকে উঠছে। পইতেটা। তবে কি সেমসাইড হয়ে গেল। দীপার কাছে এরও আসা যাওয়া ছিল। ওই যে তিনজন ঘুরছে, তার মধ্যে এ একজন। যাঃ তা কি করে হয়। হয় তো মাসী বলেই যেত। দীপা তো আমাকে একদিনও বলেনি, নীপার ছেলে তার কাছে আসে। রমণীচরিত্র এত দুর্বোধ্য। দীপার কাছে যেত না ওই পাগল করা মেয়েটার কাছে যেত। যে গেছে সেই জানে, মদের মতো, গাঁজার মতো, কোকেনের মতো। ধরলে আর ছাড়া যায় না! নীপা হার হার করে লাফাচ্ছে। আমি কিছু বলিনি। প্রশস্ত বুকের দুই সুউচ্চ পর্বতের মাঝে যে সঙ্কীর্ণ উপত্যকা, সেই উপত্যকায় হারের ছোট্ট লকেট যেন গিরিপাশে হারিয়ে যাওয়া মানুষের সোনালী ভবিষ্যৎ। আমি কি করব। 'টেম্পোরারি ইনস্যানিটি' তো হতেই পারে। মনকে বশে আনা যায়!

মেয়ে বারান্দার এপাশ থেকে ওপাশ পায়চারি করছে। আমার কথায় পোশাক পাল্টায়নি। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, এ ড্যানিয়াল কাম টু জাজমেন্ট। পায়চারি করতে করতে বলছে:

'আমি জানতুম এই রকম একটা কিছু হবে। সব কিছুর একটা সীমা আছে। সব কিছুর একটা শেষ আছে

তোমরা দু'জনে মিলে ছেলেটাকে শেষ করে দিলে। আজ এক বছর হয়ে গেল, তোমরা ওর সঙ্গে কথা বলোনি। ধীরে ধীরে মেন্টাল টর্চার করে মেরে ফেললে। এর বিচার হবে না? আমি সাক্ষী দেবো।'

আমার সামনে এসে আঙুল তুলে বললে: ইউ আর এ স্কাউন্ড্রেল। বুড়ো ভাম। তোমার সব ইতিহাস আমি জানি। তুমি ওই মহিলাকে পড়াতে। তাকে তুমি রেপ করেছিলে। অ্যাণ্ড গট দিস বেবি। হি ইজ ডেড নাও। তোমরা চেয়েছিলে ও পেটেই মরে যাক। ইউ ওয়াণ্টেড টু কিল হিম ইন দ্য উম্ব, টলারেটেড হিম ফর এ সার্টেন পিরিয়াড অফ টাইম। তোমরা ওকে ভালবাসনি। সহ্য করেছ মাত্র। মার্ডারার। কিলার। সাইলেণ্ট কিলার। পেস্ট। ভারমিন। স্বার্থপর। চরিত্রহীন। নিজেরটা ছাড়া তোমরা কিছু বোঝ না।

বহুকালের ইচ্ছে ওকে ঠেসে একটা চড় কসাই। নিজের মেয়ে হিসেবে মারা যায়। ওকে আর আমার মেয়ে ভাবা যায় না। সিনেমা-ম্যাগাজিনের পাতায় দেখা ফিল্মকুমারী! বিদেশী বিশ্রী ম্যাগাজিনের পাতার পিনআপ গার্ল। ওই

পাড়াতেও দেখেছি এই রকম স্পেসিমেন। আমি স্থিতপ্রজ্ঞ। বীতশোক ভয়ঃ ক্রোধঃ। আমার রাগ উচিত হবে না।

একটা কাশির শব্দ এগিয়ে আসছে। আমার সেই প্রতিবেশী। যাঁর নাম রেখেছি আমি, সমাজের তৃতীয় নয়ন। তিনি আসছেন। তাঁর আরও একটা নাম রেখেছি রয়টার।

আমি গম্ভীর গলায় আমার অপ্সরা কন্যাকে বললুম, 'তুমি ঘরে যাও। এ পোশাকে ভদ্রঘরের মেয়ে বাইরের লোকের সামনে বেরোয় না।'

'আমি ভদ্রলোকের মেয়ে নাকি। কি রকম ভদ্রলোক। মেয়ের দিকে সেই ভদ্রলোক কিভাবে তাকায়।'

এবারেও ইচ্ছে করছিল ঠাস করে একটা চড় মারি। আমি স্থিতপ্রজ্ঞ। কাশীবাবু এগিয়ে আসছেন কাশতে কাশতে। আমিই সরে গেলুম। আমার এখন আত্মগোপনের সময় এসেছে। ফল দেখে মানুষ বৃক্ষকেই সন্দেহ করবে। বৃক্ষটিকেই আগে উৎপাটিত করা উচিত। পাপকে প্রচ্ছন্ন রাখাটাই ধর্ম। ঠেলে বেরিয়ে এলেই বিচার। আমি দেখেছি, পাপ আমার সহ্য হয় না। নীলার আংটির মতো। আমি যে নীলকণ্ঠ নই।

পুলিস অফিসার বললেন, 'দেখি সুইসাইড নোটটা।'

পইতেটা আমি পুড়িয়ে ফেলেছি। কাগজটা এগিয়ে দিলুম। একবার চোখ বুলিয়েই অফিসার বললেন, 'এমনি সব ঠিক আছে। জলের মতো পরিষ্কার, পইতেটা কি ? শুরুটা তো বুঝতে পারছি না। বাবা, তোমার পইতে। আপনার পইতে হয়নি এখনও।'

উত্তর দেবার আগে দু এক সেকেণ্ড মাত্র ভেবেই মাথা খুলে গেল। বললুম, 'আমার সঙ্গে ওর লড়াইটা পইতে নিয়েই চলছিল গত এক বছর। আমি বলতুম ব্রাহ্মণের ছেলে, এত ঘটা করে পইতে দিয়েছিলুম, পইতেটা গলায় রাখার চেষ্টা করো। ও বলত পইতে হল কুসংস্কার। পইতে আর গায়ত্রী তুলে কথা বললে, আমার মাথায় খুন চেপে যায়। রাগের মাথায় একদিন একটা চড় মেরে বসলুম। আর একটা মারতে যাচ্ছি, ও আমার হাত চেপে ধরল। প্রশ্ন করলে, তুমি যে উপদেশ দিচ্ছ, তোমার পইতে কই ?'

'আপনার পইতে নেই ?'

"থাকবে না কেন ? সেদিন ছিল না। আমার ভীষণ ভুলো মন। প্রায়ই পইতেটাকে বাথরুমের কলের মুখে বা দরজার ভেতরের হুকে ঝুলিয়ে রেখে চলে আসি। অফিসে গিয়ে মনে পড়ে। তখন আঁতকে উঠি। ছি ছি, পইতে ছাড়া ব্রাহ্মণের ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছি !"

"আপনি খুব ধার্মিক ?"

লাজুক লাজুক মুখে বললুম, "ওইটাই আমার একমাত্র অপরাধ।"

"আমিও তো মশাই ব্রাহ্মণের ছেলে। পুলিসে ঢোকার পরই পইতে ছাড়তে হলো। ভীষণ ট্রাবল ক্রিয়েট করে। যেখানে সেখানে জড়িয়ে যায়। চান করে গা মোছার সময় বগলের চুলে জড়িয়ে গেলে বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়। আর অসুবিধে করে রাতে বিছানায়। ঠিক কি না!"

ভদ্রলোক হা হা করে পুলিশী হাসি হাসলেন। আমি বললুম...

"সেন্ট পারসেন্ট কারেক্ট। আমি ওই জন্যে বিশেষ বিশেষ সময়ে খুলে রেখে দি।"

"খুলে ভুলে যাওয়ার চেয়ে ফেলে দেওয়া ভালো। সেই বলে না, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। এখন আপনার গলায় পইতে আছে ?"

"না।"

"কোথায় ফেললেন, বিছানায় না বাথরুমে ?"

"সেইটাই তো স্টোরি। সেই থেকেই তো এই।"

"কি রকম ?"

"কাল আবার পইতে নিয়ে ফাটাফাটি হচ্ছে, এমন সময় ও যত সব কুসংস্কার বলে পইতেটা টান মেরে ছিঁড়ে দিলে। আমি স্তম্ভিত। আমি ওকে স্ট্রেট বললুম, দ্যাখো, তুমি খুব মডার্ন, ধর্ম মানো না, আমি মানি। তুমি এই যে কাজটি করলে, সেকাল হলে তুমি এখনি ব্রহ্মতেজে ভস্ম হয়ে যেতে। ব্রাহ্মণ আমি। ব্রাহ্মণত্ব হারালেও, পাপের প্রায়শ্চিত্তের অধিকার আমার আছে। তোমার জন্যেই আমি আত্মহত্যা করব।"

"আপনি তো দিব্যি বহাল তবিয়েতে চকচকে শরীর নিয়ে বেঁচে আছেন।"

"আহা, সবটা শুনুন। ঘটনা ঘটে যাবার ঘণ্টাখানেক পরে ও আমার ঘরে এল।"

ও আমার ঘরে এল, বলতে বলতেই কেন জানি না, আমার গলা ধরে এল। আমি কেঁদে ফেললুম। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল জীবনের অতীত। সেই চিলেকোঠা। নীপা ঢুকছে। রঙ্গীন নীপা। হাতে রুমালের ঝুলিতে সুগন্ধী ফাগ। তারপর। তারপর কোনও রকমে একটা বিজাতীয় বিয়ে। গর্ভবতী নীপা। আত্মীয়-স্বজনের ছিছি। নীপার বাবা। মুখে পান জর্দা। নীপার মা খাটে মৎস্য কন্যা। চুন লাগানো পানের বোঁটা নাচাতে নাচাতে, নীপার বাবা বলছেন, ঘাবড়াবার কি আছে। এ রকম হতেই পারে। আজ তোমার চাকরি নেই। কাল তুমি চাকরি পাবে। ওই আত্মীয়রাই তখন তোমাকে কোলে তুলে নেবে।

জগতের যা নিয়ম ! নীপার ছেলে হল। লাল এতটুকু একটা পুতুলের মতো। তখন অভাব আর নেই, আছে স্বভাব। সেই ছেলে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও হাত পা ছোঁড়ে, কখনও ঘুমোয়। এর পর দশটা বছর, সন্দেহের বছর। নীপা কি করতে চায় ! কার সঙ্গে ঘুরতে যায় ! ভুল বোঝাবুঝি, ঝগড়াঝাঁটি। এরই মাঝে নীপাকে আবার মা করে দিলুম। শিশু কিশোর হল, যুবক হল। ক্রমশই দূরে সরতে লাগল। আমার আশা ছিল, একদিন না একদিন সে 'কি গো বাবা' বলে ঘরে আসবে, আর আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কনফেস করব। আমার সুখের কথা বলব, অসুখের কথা বলব।

"ও আমার ঘরে এল, এই ছিল আমার স্বপ্ন। 'ও আমার ঘরে আর কোনওদিন আসবে না, কোনও দিন না, এ আমার দুঃস্বপ্ন। কিছু কিছু অপরাধ আছে, যা ক্ষমা করে নিলে, যা ক্ষমা করে দিলে, পৃথিবী উল্টে যাবে না ; কিন্তু আমরা পারি না। মানুষের যেমন পিত্ত হয়, উচ্ছে, করলা, নিমপাতা খেতে হয়, পৃথিবীরও তেমনি পিত্ত-প্রকোপ হয়, যার ওষুধ তিক্ত ঘটনা। তা না হলে তিক্ততা কেন সযত্ন বোতলে, জীবন-বোতলে সঞ্চিত থাকে।'

চোখ মুছে, ঢোঁক গিলে আমি বললুম "অফিসার গল্পটা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে। অনেক লুজ-এণ্ড চারপাশে ঝুলছে। আজ থেকে পঞ্চাশ কি ষাট বছর আগে হলে চলে যেত। এ গল্প এখন টাইম-বারড।"

"তাহলে আবার নতুন করে শুরু করি। নতুন ভাবে।"

"প্রয়োজন নেই। এ তো আর আধুনিককালের বধূহত্যা নয়। যুবকের আত্মহত্যা। নিজের ঘরে আত্মহত্যা। সিম্পল কেস। সামান্য ফর্মালিটিজ। পোস্টমর্টেম। এদিক ওদিক খরচপত্তর।"

সিগারেট ধরালেন। পোড়া কাঠিটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়তে চাইলেন, গ্রিল ছুঁয়ে ফিরে এল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে এদিক ওদিক তাকালেন, তারপর বললেন, "ফ্যামিলি প্ল্যানিং করেন ?"

"ও সিওর।"

"তাহলে আর ছেলে··· ।"

"না না আর না। জীবনের তার ছিঁড়ে গেছে। আর বাজবে না।"

"এঃ এই একটা বোকার মতো কথা বললেন, অতটা আত্মবিশ্বাস মুনি-ঋষিদেরও ছিল না। যতদিন প্রডাকসান লাইনে থাকবেন, মেশিন ঠিক থাকলে আর কন্ট্রোল না থাকলে, মেশিনের কাজ মেশিন করবেই। আপাতত তাহলে ওই মেয়ে !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"সাংঘাতিক দেখতে। সত্যি বলছি বিশেষ বিশেষ ম্যাগাজিনের পাতা ছাড়া এমন মাল, আই অ্যাম সরি, পুলিশ লাইনে এসে মুখটা একেবারে নর্দমা হয়ে গেছে, ভাবতে পারেন এক সময় আমি কবিতা লিখেছি, সে কবিতা ছাপাও হয়েছে।"

মেয়েকে মাল বলায় ভেতরটা জ্বলে উঠল। মনে মনে ভদ্রলোককে জুতো পেটা করলুম। মুখে বললুম,

"আর বলবেন না, মানুষের যৌবনে কি যে না হয়!"

"দ্যাটস রাইট। আর জানেন তো, কবিতার ইনসপিরেশান হল মেয়েরা। আমার বউ ছিল আমার ইনসপিরেশান।"

"প্রেম।"

"হ্যাঁ প্রেম। মেয়েদের এক এক গাছা চুল এক একটা কবিতা। গোটা শরীরটা একটা মহাকাব্য। আপনার মেয়ের জন্যে ক'জন আত্মহত্যা করেছে?"

"ওই ফিগারটা আমার ঠিক জানা নেই। তবে আমি লাইনে আছি।"

"আরে ছি ছি বাপ হয়ে মেয়ের লাইনে, ইনসেস্ট।"

"না না মেয়ের লাইনে নয়, আত্মহত্যার লাইনে। ঘাড় থেকে নেমে গেলে বাঁচি।"

"তাই বলুন, ইনসেস্টের পানিশমেন্ট সাংঘাতিক। তা বেশ কিছু দিন আগে আমাকে একটা প্রোপোজাল দিয়েছিলেন মনে আছে?"

"আপনার ছেলের সঙ্গে!"

"দ্যাটস রাইট।"

"মেয়ে এখন আমার হাতের বাইরে।"

"তা ঠিক, ও এখন ন্যাশান্যাল প্রপার্টি। তবে কোনওভাবে ওকে যদি একবার আমার হাতে ফেলে দিতে পারেন, আমি ধাতে এনে দেব। যাক এ সময় একথা চলে না। আপনি ওই চিরকুটটা ফেলে দিন। একালের যুবকের আত্মহত্যার একটাই স্টোরি, ফ্রাসট্রেশান, ডিপ্রেসান। দুটোকেই চোখে দেখা যায় না। অদৃশ্য শত্রু।"

সংসারে একটা মৃত্যুর কত প্রয়োজন ছিল! সেই মৃত্যুটা আমার হলে কত ভাল হত! বাঁচতে বাঁচতে মানুষকে বাঁচার নেশায় ধরে। ইনটকসিকেশান অফ লাইফ। যে যত বেশি বাঁচে তার তত মৃত্যুভয়। আমি একবার, দুবার আত্মহত্যার কথা ভেবেছি। একবার মাঝরাতে একটা সুন্দর প্লেটে কুড়িটা ঘুমের বড়ি সাজিয়ে এক গেলাস জল নিয়ে বসে রইলুম সারারাত। মরা আর হল না।

সারা রাত মরার বিরুদ্ধে, আত্মহননের বিরুদ্ধে কত যুক্তি-তর্ক ! আত্মহত্যা মহাপাপ। আমি যেন কত পুণ্যাত্মা ! সংসার কারাগারে এসেছ। পুরো মেয়াদ খেটে প্রারব্ধ ক্ষয় করে চলে যাও। আর আসতে হবে না। কে বলেছে আর আসতে চাই না। জন্ম জন্ম সাধ যে আমার। মায়ের কোলে আসি আবার। আমার একটা কর্তব্য নেই ! আমার ছেলে, মেয়ে, বউ। কত কর্তব্যই যেন আমি করছি ! ভাবি আর সেই কুড়িটা সাদা বড়িকে প্লেটে নানাভাবে সাজাই। ফুলের মতো, ফলের মতো, জ্যামিতিক নকশার মতো। শেষে সব ক'টাকে শিশিতে ভরে, এক গেলাস জল দিয়ে একটিমাত্র খেয়ে শুয়ে পড়লুম। পরের দিন বেলা বারোটায় ঘুম ভাঙল। হেল অ্যান্ড হার্টি।

নীপা আর নীপার মেয়েতে হাত মিলে গেছে। এই মেয়েই মাকে একদিন বলেছিল, 'বীচ' 'হোর'। ওরা আমার সঙ্গে কথা বলে না। আমি 'প্লেগ' আমি 'ভাইরাস', আমি 'ফিল্‌দি লাউস'। আমি 'ডগ'। 'আই এক্সক্রিট ব্যাডওভার।' আমি যখন ছাপকা ছাপকা লুঙ্গি পরে বসে থাকি তখন আমাকে মনে হয় 'পিম্প।' আমি গেরস্থর অমঙ্গল। আমার ছায়ার রঙ কালো। আমার হাত দুটো শয়তানের থাবা। আমার চোখ দুটো নরকের আগুন। আমার নিঃশ্বাসে যোনির গন্ধ। আমার জিভ ব্যাঙের জিভ। আমার চুল লম্পটের চুল। আমার ঘাম পেঁয়াজের রস। আমি আসি আমি যাই। কেউ কথা বলে না, তাকায় না। কখনও চা দেয়, কখনও দেয় না। কোনও দিন ভাত জোটে কোনও দিন জোটে না। কখনও যাওয়া আসার পথে মুখোমুখি হয়ে গেলে, এমনভাবে সরে যায় যেন আমি কলকাতার রাস্তার ছাড়া ষাঁড়।

এই আমার পাওনা। মাঝে ভাবি ফ্ল্যাটটা বেচে দিয়ে টাকাটা ব্যাঙ্কে ফিক্‌সড করে দেব। সে উপায় রাখিনি। কাগজপত্র সব নীপার নামে। তখন মনে হয়নি আমার বরাতে এই ব্যবহার জুটবে। আর তো কয়েক বছর পরে রিটায়ার করব, তখন আমি কোথায় থাকব, কে দেখবে আমাকে ? জীবনের এই শেষ পরিণতির কথা তো ভাবিনি।

রাতে আমার ঘুম আসে না। জানালার ধারে বসে থাকি। সামনে প্রশস্ত পথ। আলো আঁধারে ঢাকা। দেখতে পাই, একটা খাট ফুলে ফুলে ঢাকা এগিয়ে চলেছে। যত দূর যায় শুধু খই আর ফুল। আমার ছেলে চলেছে বন্ধুদের কাঁধে চড়ে। আমার আমি থেকে আমার আমি বেরিয়ে চলে গেল। ডাকে নি, তবু লিখেছিল, বাবা। ছেলেটা মনে মনে আমাকে ভীষণ ভালবাসত। আমার গৌরবে গৌরবান্বিত হতে চেয়েছিল। বাবার পরিচয়টা যাতে আরও, আরও আরও বড় হয় তাই সে চেয়েছিল। এখন বুঝি নিজের জন্যে তার হতাশা ছিল না, সে হতাশ

হয়েছিল আমার জীবন দেখে। ভোগী, ব্যভিচারী, অলস, নিদ্রাকাতর। লোকটা পড়ে, জ্ঞান দেয়, ধর্মের বুলি আওড়ায় অথচ গলার পইতেটা ফেলে আসে এক অশিক্ষিতা, দেহবাদী, পরাশ্রয়ী মহিলার গোদা পায়ে। রাজা দশরথ মৈথুনকালে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। আমিও তো এক দশরথ। ছেলের মৃত্যু তো আমারই মৃত্যু। জীবনের শেষ রমণী আস্বাদন, শেষ সম্ভোগ, শেষ ব্যাভিচার সমাপ্ত।

আমার সব স্বপ্ন ছুটে যায় প্রান্তর পেরিয়ে
বাতাস, উজ্জ্বল বাতাসে ভ্রমণ
গভীর অরণ্য, মানুষের অগম্য
শীতল নির্জন নদী, স্বপ্ন-পথিক
বহুদূর থেকে ভেসে আসে আহ্বান
আমার যাবার নৌকার শ্বেতশ্মশ্রু মাঝি।

আমি ওদের প্রশ্ন করতে পারতুম, তোমরা কি চাও ? কি ভেবেছ তোমরা ! জানি কি উত্তর—জগৎ হল আরসির মুখ দেখা। যেমন কুকুর তেমন মুগুর। আমি তো বলতে পারি। একটু এদিক-সেদিক করেছিই নাহয়, সে তো তোমরাও করেছ, কর্তব্যে অবহেলা দেখেছ কি ! সে কথা মানবে না।

সেদিন রাতে একটা চিঠি লিখলুম—

নীপা,
নাকে আর কাঁদবো না। কিছু চাইতে হলে তাঁর কাছেই চাইব। ভালবাসার কথা এ বয়সে মানায় না। ন্যাকা ন্যাকা শোনায়। তুমি যাই করো, আমার মনে তোমার আসন পাকা। বিশ্বাস করো আমার জীবনে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। ছিলও না কোনও দিন। বাকি সব খেলার খেলা। এক ধরনের অ্যাডভেনচার। ঘর ছেড়ে মানুষ পাহাড়ে চড়তে যায় জয়ের আনন্দে। আপাতত আমি তোমাদের জীবন থেকে সরে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে চিঠিতে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব। সংসার তোমাকেও যখন ফেলে দেবে, চলে এস আমার কাছে। যাবার আগে বলে যাই, আমি ছাড়া তোমার আর কেউ নেই।

রাত তখনও ভোর হয়নি। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে আলোর রঙ ধরেছে। রাস্তায় নেমে এলুম। এখনও কেউ জাগেনি। দু-একজন কাগজের হকার সাইকেলে চলেছে কাগজ আনতে। পেছন ফিরে শেষবারের মতো দেখে নিলাম আমার দৌলতখানা। যত এগোতে থাকি পেছনের অদৃশ্য আকর্ষণ তত প্রবল হতে থাকে। আমি যেন চেন দিয়ে বাঁধা। আমাকে টেনে রেখেছে। এই হল মানুষের

মোহ ! যা নেই তা আছে মনে হবে, যা আছে তা নেই মনে হবে। ৬০ সে কি নীপা ! আজ থেকে তিরিশ বছর আগে ! সংসার পেঁয়াজ। ছাড়াও, ছাড়া তো ছাড়িয়ে যাও, শেষে ফক্কা।

কিছুই জানি না, কোথায় চলেছি। যাব কোথায় ! ঘরের বাইরে মানুষ এত অসহায় ! ঘর ছাড়া মানুষ, বাসাছাড়া পাখি। পুরীর টিকিট কেটে চেপে বসলুম ট্রেনে। ধীরে ধীরে ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়ছে। গতি বাড়ছে। ভেতরে পটাং করে একটা শব্দ হল যেন। সেই অদৃশ্য শেকলটা ছিঁড়ে গেল। ছেলেবেলার আকাশে যেমন শব্দ উঠত ঘুড়ি কেটে গেলে, মনের আকাশে সেই রকম চিৎকার ভোঃ কাটা। কেটে গেছি আমি। প্যাঁচ লড়িয়ে ছিলুম। সুতোও ছেড়েছিলুম। বেমক্কা টানে কেটে গেছি। কে ওড়াচ্ছিল আমাকে !

পুরীর প্রথম দিনটা খুব এলোমেলো কেটে গেল। কোনও মাথামুণ্ড নেই। সদ্যোজাত শিশুর মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। এত লোকজন ! ভ্রমণার্থী। সারাদিন সমুদ্রের ঢেউ ভাঙা। বেলাভূমিতে, জলে নারী-পুরুষের ন্যাকামি। অকারণে নাম ধরে ডাকাডাকি। বালি ছোঁড়াছুঁড়ি। ঝিনুক কুড়নো। ভিজে বালিতে পায়ের চিহ্ন এঁকে দাঁড়িয়ে থাকা, কখন ঢেউ এসে মুছে দিয়ে যাবে ! সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে মানুষের বোকামি দেখলুম। কোথাও নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ, দার্শনিক চিন্তায় বিভোর। কোথাও দেহবাদী, রমণীর সিক্ত শরীর দেখার জন্যে ব্যাকুল, কোথাও মূর্খ প্রেমিক প্রেমিকাকে আরও একটু কাছে টানতে চাইছে। পোড় খাওয়া গৃহী, গৃহিণীকে ধমকাচ্ছে। অবোধ শিশু হা হা করে ছুটছে। ধর্মব্যবসায়ী ক্রমান্বয়ে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে, পান্ডার নাম ? পিতার নাম ?' এক পাশে ঢেউ ভাঙা অক্লান্ত সমুদ্র, অন্যদিকে অক্লান্ত মানুষ। সমুদ্রের ধারে মানুষের থিয়েটার। কোনও নিরালায় বড় মাপের এক মহিলা, সমান মাপের এক পুরুষের কোলে শুয়ে, অজগরের মত হাত দিয়ে তার ঘাড়টাকে মাথা সমেত নিজের মুখের দিকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছে ? জোর করে, নতুন করে যৌবনের চেষ্টা। কার হাত ফেরতা বউ কার কোলে এসে লকারের চাবি দখলের চেষ্টা করছে। ঢেউ সাহস করে আর একটু এগিয়ে এসে ঝাপটা মারলেই, কেমিকেল যৌবন ধুয়ে জরা বেরিয়ে পড়বে।

সারাটা দিন আমার কেটে গেল এই থিয়েটার দেখে। কেবল নীপার মতো কাউকে দেখলেই নিমেষে মন চলে যাচ্ছিল কলকাতায়। বেশ মজা লাগছিল, জীবনে একটা ধাক্কা অন্তত মারতে পেরেছি। বেশ বড় রকমের ধাক্কা। ঢোকারও যেমন প্ল্যান থাকে না, বেরোবারও তেমনি প্ল্যান থাকে না। ও যখন হয় তখন হয়। রেশমকীট সিল্ক জড়িয়ে জড়িয়ে সুতো করলে, যেই মনে হল খুব হয়েছে,

নিজের সাধনা নিজেই কেটেকুটে বেরিয়ে এল। গুটির বাইরের জীবনটা তেমন নিরাপদ নয়। তবু তো মুক্তি।

The animal lives only for the day
and in its under has no memory,
the slope in Silence brings its flower to light
and is destroyed.

এতকাল বাইরে বেরিয়েছি কত আটঘাট বেঁধে সাবধানী সংসারীর মতো। এত বড় একটা বোঁচকা নিয়ে। দাঁত থেকে খাবারের টুকরো বের করার খড়কে কাঠিটিও সঙ্গে থাকত। এবার একেবারে অন্যরকম। পাখির মতো। খাঁচার দরজা খোলা। সোজা আকাশ। ডানা উড়তে ভুলেছে। মনে করাতে হবে, শেখাতে হবে। পাখির ভেতর আর একটা পাখি আছে, সেই পাখি ওড়া ভোলে না। তার সাহসেই বেরিয়ে আসা। সামান্য যা বৈভব সঙ্গে আছে, শেষ হয়ে গেলেই সামনে অপার মহিমা। নীল সমুদ্র। আর কুড়িটা বড়ি নয়। নিজেকে ঢেউয়ের ওপর শুধু শুইয়ে দেওয়া। মায়ের অজস্র লক্ষ হাত, নাচাতে নাচাতে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।

Look a timorous boat goes down
under stars
The silent face of the night.

ভাবতে বেশ ভালই লাগছিল, আমি আছি অথচ নেই। মানুষের জীবনের জন্যে দীর্ঘদিনের কতগুলো খাল কাটা আছে। জন্মাবার পর থেকেই, ঘরে যেমন জন্ম, সেই অনুসারে এক এক খাল ধরে হুড় হুড় করে বয়ে চলা। হঠাৎ সেই খাল ছেড়ে উঠে এলে অদ্ভুত লাগে, অসহায় মনে হয়। একজন মানুষের পাশে সত্যিই কিন্তু অন্য মানুষ নেই। আছে স্বার্থ। একটা কাঁচি বের করে স্বার্থের সুতোটা কেটে দাও। চার পাশে ফাঁকা। পৃথিবী একটা মস্ত দোকান। সারা জীবন শুধু কেনাবেচা। মালিক ভগবান। একটা স্বামী দাও। বেশ মোটাসোটা। কোমরের গোঁজেতে কড়কড়ে প্রেমের আঠা। একটা বউ দাও। বেশ বড় খোঁপা। বউ তুমি ছেলে দাও। স্বামী তুমি দুধ দাও। মাঠ তুমি ধান দাও। গাছ তুমি ফল দাও। পাঁঠা তুমি মাংস দাও। ছেলে তুমি অন্ন দাও। চিতা তুমি কোল দাও।

আমার বুক পকেটে একটা পোস্টকার্ড সমুদ্রের নোনা নিশ্বাসে সেঁতিয়ে গেছে। ভাবি একটা চিঠি লিখব কারুকে। দীপাকে নয়। বুঝেছি সে এক উঁচুতলার দেহ ব্যবসায়ী। চেনা লোক চেনা লোকের কাছে চক্ষুলজ্জায় ঘুষ খেতে পারে না বলে ফাইল নড়ে না। চক্ষুলজ্জায় দীপা আমার কাছে সতী

সেজেছিল। ওর ওই মেয়েটা হল মাছি ধরা জাল। অমৃতাকে লিখব ? সে কি আর আছে ! আমার অফিসের সেই মেয়েটা ! হঠাৎ মনে হল, আরে আমি তো তাকে দেখেছি। এইখানেই সে আছে। ওই যে সেই বড়মাপের মেয়েটা। সেদিন সি-বীচে গাবদা-গোবদা একটা লোকের কোলে শুয়েছিল, অজগর-হাতে গলাটা সাপ্‌টে। আরে লোকটাকেও তো আমি চিনি। ইস্ক্রুপের কারখানা আছে চেতলায়। সর্বনাশ, পাপ এখানেও তেড়ে এসেছে ! সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শেষ নেই। শেষ নেই মানুষের দেহ ভাঙানোর। এক পাউন্ড 'ফ্লেশ', একটা সোনার বিস্কুট। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে 'ওয়ালজ' চলেছে। নাচতে নাচতে জুড়ি পাল্টাচ্ছে। একবার এ ওর কাছে। সে তার কাছে। অ্যাপেনডিক্স, ন্যাবা, হাঁপানি, ক্ষয়কাশ। চোখের আলো নেবে। স্টেজের আলো নেবে না।

আমার হাতে এখন অফুরন্ত সময়। এক পাণ্ডার বাড়িতে কোনও রকমে আছি। পুরীর মন্দির থেকে প্রসাদ কিনে খাই। সবাই বলেন সুস্বাদু। আমি তেমন স্বাদ পাই না। আসলে মনেতেই ভোগের উৎপত্তি, মনেতেই লয়। মনই নরককে স্বর্গ করে, স্বর্গকে নরক। কোথাও একটা যেতে হবে বলেই চলা। আমার তো আর কোথাও যাবার নেই। আমার তো আর কিছু হবার নেই। একটা জিনিসই বেরোবার আছে, সেটা প্রাণ।

সমুদ্রের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। স্বর্গদ্বার পেরিয়ে এসেছি। হোটেল, লোকালয় সব পেছনে পড়ে আছে। বাঁ পাশে সমুদ্রের বিদ্রোহ। গভীর গম্ভীর হুঙ্কার। সামনে হাঁটা ছাড়া আমার কোনও লক্ষ্য নেই। জীবনটাকে বেশি খরচ করে প্রায় দেউলে। মানুষ টাকার হিসেব রাখে জীবনের হিসেব রাখতে ভুলে যায়। যৌবন কতটা খরচ হল ! আপন মনেই হাসলুম। বাতাসে উড়ে আসছে সমুদ্রের বালি। গাছের পাতা থেকে বালি ঝরছে ঝুরঝুর করে।

পথ ক্রমশ উঁচু হতে হতে আমাকে তুলে দিলে বিশাল একটা বালির পাহাড়ে। এ যেন আগ্নেয়গিরি। মাঝখানে একটা কন্দর। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলুম। উঁকি মেরে অবাক। ভেতরে মায়ার খেলা। বেশ ঘন একটা জঙ্গল। কাজু বাদামের গাছ। একটা পথের রেখা নেমে গেছে নিচের দিকে। সাহস করে নামতে লাগলুম নিচের দিকে। মনে হল স্বপ্ন দেখছি। এক জায়গায় জঙ্গল অনেক পরিষ্কার হয়ে গেছে। সামনেই একটা সরোবর। থই থই করছে পদ্ম। টলটল করছে পদ্মপাতা। অর্ধচন্দ্রাকারে একটি গৃহের ভগ্নস্তূপ। আকার আকৃতি দেখে মনে হল কোনওকালে কোনও রাজার প্রাসাদ ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার, কিভাবে এই আয়োজন চলে গেছে বালির কূপে। চারপাশ অসম্ভব নিস্তব্ধ। জনপ্রাণী আছে বলে মনে হয় না। ওপর দিকের গাছে বাতাসের শব্দ। ঝিরঝির

বালি ঝরছে। হঠাৎ চোখে পড়ল ধোঁয়া। দূরে একপাশে ফিকে ধোঁয়া উঠছে। সেইদিকে এগিয়ে গেলুম। দেখি এক সন্ন্যাসী বসে আছেন। হাসছেন আপন মনে। তিনটে ইটের ওপর মাটির একটা হাঁড়িতে প্রচুর জলে কুচি কুচি শাকের ডাঁটার মতো কিছু একটা ফুটছে। শুকনো ডালপালা পুড়ছে পটপট শব্দে। সাধকদের বয়েস বোঝা শক্ত। দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র পদ্ম-সরোবর থেকে স্নান সেরে এসেছেন। স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল চেহারা। প্রশান্ত চোখ। মুখে অনাবিল হাসি।

হেঁট হয়ে প্রণাম করতেই পরিষ্কার ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, 'টুরিস্ট ?'

এক পাশে বসে পড়ে বললুম, 'ঠিক টুরিস্ট নই। বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।'

হাসলেন। অদ্ভুত সেই হাসি। কিছুই আর বলছেন না। দূরে তাকিয়ে আছেন। বাধ্য হয়ে আমিই প্রশ্ন করলুম, "এই জায়গাটা কেমন ?"

"খুব ভালো।"

"সাপ নেই ?"

"আছে তো। অনেক সাপ আছে।"

"বিছে ?"

"বাঃ বিছে না থাকলে হয়! কাঁকড়া বিছেও আছে।"

"বৃষ্টি হলে জল পড়ে না ?"

"ওঃ খুব জল পড়ে। একেবারে ভেসে যায়।"

হাসতে লাগলেন। জল পড়ার কি আনন্দ!

"ভিজে যাবেন তো!"

"ভিজলেই বা। আবার শুকিয়ে যায়।"

সন্ন্যাসী যেখানে বসে আছেন তার মাথার ওপর দালানের ছাদ ভেঙে কড়ি বরগা সমেত ঝুলে আছে। যে কোনও মুহূর্তে মাথায় পড়তে পারে। দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "ভেঙে পড়বে যে!"

একবার তাকালেন, হাসতে হাসতে বললেন, "ওইভাবেই তো আছে। কতদিন হয়ে গেল। পড়েনি তো ভেঙে!"

লক্ষ করলুম প্রশ্ন না করলে সন্ন্যাসী কথা বলেন না, কিসের আনন্দে বিভোর হয়ে কেবল হাসেন। দেখলেই মনে হয় আনন্দ সাগরে ভাসছেন। তাঁর এই ভাব আর উজ্জ্বল মূর্তির সামনে যে-কোনও প্রশ্নই মনে হচ্ছে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর। সেই প্রথম মনে হল, আমি একটা মূর্খ, আমার ভেতরে কিছু নেই। ভেতরে আছে একটা ফ্ল্যাট, গোটাকতক মেয়েছেলে, আধ ডজন ইন্দ্রিয়। আছে, লিভার, পিলে,

হৃদযন্ত্র, মূত্রাশয়, স্টম্যাক, কোলন, গাটার। আমি সারাজীবন যা বুঝে এসেছি, তা হল, দুই আর দুয়ে চার। সেই বোধ দিয়ে এই মহাবোধিকে বোঝা অসম্ভব। নীরব ভাষায় তিনি যা বলে চলেছেন তা হল, আমি যে জায়গায় পৌঁছেছি সেখানে আসতে তোমার হাজার জন্মের সাধনা চাই। বউ আর মেয়ের লাথি কলকাতা থেকে পুরী পাঠাতে পারে। দিনকতক পরে আবার ন্যাজ গুটিয়ে ফিরেও যেতে পার। তাঁকে পেতে হলে সংসারের লাথি নয়, তাঁরই কৃপা চাই। কৃপা, কৃপা, কৃপা।

ভেবেছিলুম, যাক, যিনি আঁশটে সংসার ছাড়ালেন, তিনিই বোধহয় পাইয়ে দিলেন। না তা নয়। তিনি শুধু বুঝিয়ে দিলেন, এ আধার সে আধার নয়। তুমি হলে লেডিজ আমব্রেলা। ভাবছ গজছত্র হবে! ভাঙা জিনিস আরও ভেঙে গেল। মনটাকে কোনও মতে বৈদান্তিক ভাবনার আঠা দিয়ে জুড়ে রেখেছিলুম। ভেছবেছিলুম শেষটায় একটা ঝিকি মেরে উঠে যাব পরমহংসের স্তরে। নিমীলিত আঁখি মেলে বসে থাকব মখমলের উচ্চাসনে। পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসবে নীপা ব্রণকন্টকিত দীপা। সেবাদাসী হয়ে সেবা করবে দীপার বাড়ির সেই মেয়েটা। ওরা তখন বুঝতে পেরে যাবে, আগে আমি যা করেছি সবই পরমপুরুষের লীলা। ঘুরতে ঘুরতে ভূকন্দরস্থ এই মহাপুরুষের সামনে এসে মনে হচ্ছে, পশুদের যেমন জাত আছে, মানুষেরও সেই রকম জাত আছে। বাঘ ছাগল খাবে, ছাগলে ঘাস খাবে। বলদ হাল টানবে। গাধা মোট বইবে। কুকুর প্রভুর পা চাটবে। শ্রীচৈতন্য, জয় রাধে বলে ওই কালো জলে ডুববেন, যীশু আমেন বলে ক্রুশবিদ্ধ হবেন, বুদ্ধ ধ্যানস্থ হবেন বোধিবৃক্ষের তলে। আর আমি হাত বোলাবো রমণীর নিতম্বে।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে যত হাসেন, আমার ততই মনে হতে থাকে, আমার আবর্জনাময় ভেতরটা ক্রমশই প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। ওই দৃষ্টির সামনে আমি ছোট হতে শুরু করেছি। গোটাতে, কোঁচকাতে শুরু করেছি। শেষে আমি ভয়ে উঠে পড়লুম। যাঁরা মানুষের ভেতরটা পড়তে পারেন তাঁদের সামনে বেশিক্ষণ বসা যায় না।

মহাপুরুষ কোমল গলায় বললেন, 'এসেছো প্রসাদ না পেয়ে চলে যাবে। দাঁড়াও।'

কাঠের জ্বাল থেকে মাটির পাত্র নামালেন। একটা কাঁসার বাটিতে সেই ফুটন্ত জল ঢেলে, চোখ বুজিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হলেন। চারপাশ নিস্তব্ধ। বাতাসের শব্দ। বালি ঝরছে চিন চিন শব্দে। যেন মহাকালের মূর্তি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে। এক সময় চোখ খুললেন। এইবার একেবারে পূর্ণদৃষ্টি।

নীলোৎপল আঁখি শুনেছিলাম, এই প্রথম দেখলাম। মানুষের চোখেই আগে কামনার লাল রঙ ছাপকা ছাপকা হয়ে ওঠে। কামনাশূন্য এমন দীপ্ত দেখলে বড় কষ্ট হয়। শৈশবে আমার চোখও তো এই রকম ছিল।

আমার দিকে তাকিয়ে আবার সেই সমুদ্র-সফেন হাসি। একটা বাটিতে সেই ভোগ ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। গরম জলে ডাঁটার মতো টুকরো টুকরো ভাসমান পদার্থ।

সস্নেহে বললেন, 'নাও সেবা করো। পদ্মফুলের ডাঁটা। খেয়ে দেখ অমৃত!"

তিনি আহার শুরু করলেন। মুখে চোখে ফুটে উঠল তৃপ্তির ভাব।

বললুম, 'এই খেয়ে..."

কথা শেষ হল না। এ কি বোকার মতো প্রশ্ন। নিজেই হেসে ফেললুম, তিনিও হেসে উঠলেন হা হা করে। দু' জনেই দু' জনকে বুঝে ফেলেছি। আমার প্রশ্ন উঠছে ভোগের শরীর থেকে আর উত্তর আসছে যোগের শরীর থেকে। দেহে দেহে ব্যবধান তিন হাত। মনে মনে ব্যবধান সমুদ্রের।

তিনি বললেন, "আবার এসো।"

আমি ফিরে এলুম আমার সেই পাণ্ডার বাড়িতে। তার শিশুটি এখন আমার বন্ধু। আমাকে যে ঘরটা দিয়েছে সেই ঘরেই সে খেলছিল। স্যাঁতানো পোস্টকার্ডে নীপাকে ঠিক তিন লাইনের একটা চিঠি লিখলুম, পুরীর সমুদ্র সৈকতে আছি। তিন জনের পথ চেয়ে। মৃত্যু, মহামানব আর তুমি। দেখি, কে আসে, কে আসে।

চারটে দিন একইভাবে কেটে গেল। পঞ্চম দিন থেকে শুরু হল আমার তাকানো। ভাঙা জাহাজের নাবিক সমুদ্রে কাঠের ভেলায় ভাসতে ভাসতে দিগন্তের দিকে তাকায়। কোনও জাহাজের মাস্তুল, অথবা কোনও স্থলভাগের সবুজ। সমুদ্র সৈকতে আমি তাকাই, নীপা কি এল। ইচ্ছে করে এগিয়ে যাই ভিড়ের দিকে।

সন্ধ্যা নামতে থাকে। ক্লান্ত হয়ে তখন সরে আসি নির্জনে। অন্ধকারে আর তো মুখ খোঁজা যাবে না। রাত যত বাড়ে সমুদ্র ততই জ্বলতে থাকে। ফেনার ফসফরাস ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ঢেউ-এর পেছন পেছন ছুটতে থাকে। মনে পড়ে যায় একটি শবযাত্রার কথা। ভেসে আসে কণ্ঠস্বর। বাবা, তোমার পইতে। এখনও সময় আছে। জীবনের ধারাটা পাল্টাও। এতকাল কাঁচের ঘরে ছিলুম। এক ঢিলে সব চুরমার।

সাদা চাদর গায়ে এক সৌম্য বৃদ্ধ আমার মতই বসেছিলেন কিছু দূরে। আঁধার নামছে বিশাল সমুদ্রে। বৃদ্ধ হঠাৎ বললেন,

"কোথাও কি দেখা হয়েছিল, আমাদের দু'জনে ?"

কণ্ঠস্বর খুব চেনা মনে হল। ভালো করে তাকালুম। মুখের একটা পাশ দেখছি। তনুর বাবা না ?

"দিল্লিতে কি ?"

"ট্রেনে আলাপ !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। হু হু বাতাসে তাঁর উত্তরীয় প্রান্ত উড়ছে। উড়ছে চুল।

"আমি তনুর বাবা।"

"চিনতে পেরেছি।"

"কি খবর তোমার ! বেশ কয়েকদিন হল তোমাকে ঘোরাফেরা করতে দেখছি। কি হয়েছে তোমার !"

"পুরো উপন্যাস শুনবেন ?"

"না, পুরোটা শোনা পণ্ডশ্রম।"

বৃদ্ধ আমার পাশে এসে বসলেন। ধূপের গন্ধ পেলাম। ডান হাতটা আমার কাঁধে রাখলেন। বললেন,

"সব উপন্যাসই এক, তবে শেষটা, শেষটায় কে কেমন প্যাঁচ মারতে পারে সেইটাই দেখবার। আর এই শেষটায় আমার জন্যে মাঝখান থেকে কি খেলা শুরু হল ! তা না হলে, সেই জন্ম, শিক্ষা, কর্ম, বিবাহ, সংসার, টালমাটাল, ভোগান্তি, মৃত্যু। তুমি কি শেষে এসে গেছ !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। লাস্ট চ্যাপ্টার।"

"ছোট উপন্যাস !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ বিস্তারটা বড় ছিল, ধরে রাখতে পারলুম না। বেরিয়ে গেল।"

"কাঁচা হাত ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তালগোল পাকিয়ে বেরিয়ে এসেছি।"

"অবশ্যই ট্র্যাজেডি।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"মৃত্যু ঢুকিয়েছ ?"

"হ্যাঁ। ছেলের মৃত্যু।"

"হাতে আর কটা চরিত্র থাকছে ?"

"নায়ক ছাড়া আরও দুটো। বেঁকে যাওয়া স্ত্রী আর বিপথগামী কন্যা।"

"কুঁচো চরিত্র !"

"সব ঝরে গেছে।"

"শেষটা কিভাবে লিখবে ! কোথায় লিখবে ?"

"শেষটা সোলো পারফরমেনস। এইখানে। সমুদ্রের সামনে। মুখোমুখি। ফেস টু ফেস।"

"তোমার চেয়ে আমার উপন্যাস অনেক বোলড। একেবারে ট্র্যাজেডির ট্র্যাজেডি গ্রীক ড্রামা। একটা অ্যাকসিডেন্ট। স্ত্রী শেষ, তনু শেষ। আর এই দেখ আমার বাঁ হাত শেষ। তোমার একটা মৃত্যু, আমার তিনটি। ছেলের হয়েছিল কী ?"

"আত্মহত্যা।"

বৃদ্ধ বসে রইলেন কিছুক্ষণ চুপচাপ। অন্ধকারে মনে হচ্ছে পাথরের মূর্তি। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন,

"পাপ করেছিলে ?"

"অনেক।"

"ছেলের আত্মহত্যার জন্যে নিজেকে দায়ী করছ ?"

"পঞ্চাশ ভাগ।"

"শেষটা প্রায়শ্চিত্ত ?"

"টেঁকা গেল না।"

"কি করবে ?"

"জানি না ?"

"তোমাকে আমি ছেলের মতো ভাল বেসেছিলুম।"

"আমি আমার পিতাকে ত্যাগ করেছিলুম।"

"তোমার সন্তানও তোমাকে ত্যাগ করেছে।"

"আমার পিতা স্বগৃহে দেহত্যাগ করেছিলেন।"

"যুগ বদলেছে। গৃহ তোমাকে ত্যাগ করেছে।"

"সন্তান আর পাব না। আমি পিতাকে চাই।"

"তোমার পাশে। তাহলে শেষ লেখাটা শুরু হোক।"

"সন্তান, মানে আমার ডান হাত গেছে।"

"তোমার ডান হাত, আমার বাঁ হাত। তার সঙ্গে গেছে বিবেক। জান তো স্ত্রী হল মানুষের বিবেক।"

অন্ধকারে আমরা কেউ কারুকে স্পষ্ট আর দেখতে পাচ্ছি না। বহুকাল আগে এক পিতা পুত্র এই বেলাভূমিতে পাশাপাশি বসে গেছে।

কিছুকাল আগে এক ভাই, এক বোন, এই বেলাভূমিতে টলে টলে ছুটেছে, এক স্বামী এক স্ত্রী পাশাপাশি বসে দেখেছে। আজ অন্ধকারে পাশাপাশি দুই

পিতা। একজন একটু এগিয়ে আছে, আর একজন একটু পেছিয়ে। দু-জনেরই সামনে সমুদ্র। গভীর গম্ভীর তার শাসনের গর্জন। ফেনার ফসফরাস প্রতি মুহূর্তে জন্মাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে মরছে।

বৃদ্ধ বললেন, "সমুদ্রেই উৎস, সমুদ্রেই জীবনের লয়। এ যেন বিশাল এক গর্ভসলিল। যতদিন তুমি হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ, ততদিন তুমি মায়ের। যেই তুমি নিম্নপদ ঊর্ধ্বমুণ্ড, তখনই তুমি ভূমির। সব কাহিনীই এক। মাথা নিচু করে প্রবেশ। মাথা উঁচু করে প্রস্থান।"

প্রৌঢ় উঠে দাঁড়ালেন। চাদরে ঢাকা সাদা মূর্তি। আমি তখনও বসে আছি তাঁর পায়ের কাছে। প্রশ্ন করলেন,

"তুমি আর জন্মাবে ?"

"না। সামান্যতম ইচ্ছে নেই।"

"আমি আবার জন্মাব। আবার মায়ের কোলে আসব। আবার ছাত্র। আবার যুবক। আবার গৃহী। শুধু একটা ভুল আর করব না। নিজের লেখা, নিজে আর লেখার চেষ্টা করব না। এবারটা আমি আমি করে গোলমাল হয়ে গেল। সামনের বার তুমি তুমি।"

সমুদ্রের বিশাল একটা ঢেউ সুইশ করে আমাদের পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল। জলের জল ফ্যানা হয়ে নাচতে নাচতে ফিরে চলেছে জলে। সময়ের কোল থেকে সময়ই ছিটকে আসছে জীবদেহের মোড়কে। নাচতে নাচতে আসছে সগর্জনে, নাচতে নাচতেই ফিরে যাচ্ছে কোমল সুরে। জীবন সময়ের সফেন আন্দোলন।

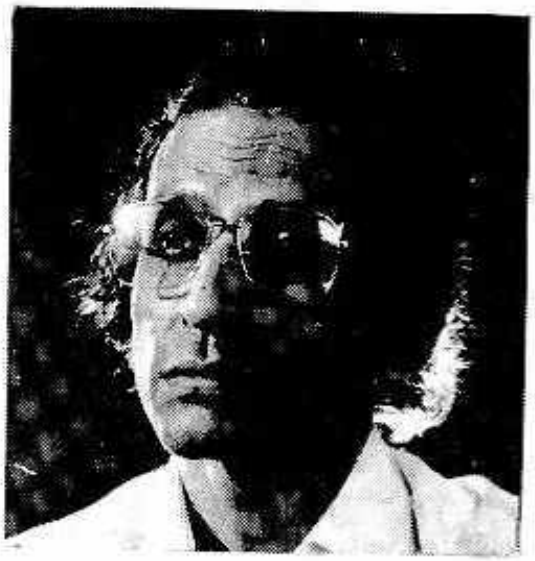

জন্ম : ১৯৩৬ ।
শৈশব কেটেছে ছোটনাগপুরের নির্জন পাহাড়ী অঞ্চলে । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক । কিছুকাল রামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, কিছুকাল প্রব্রজ্যা, কিছুকাল সরকারী চাকরি । এখন পেশা সাংবাদিকতা । প্রথম প্রকাশিত লেখা একটি গল্প— 'সারি সারি মুখ' । নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত অবস্থায় কয়েকটি নাটক রচনা । প্রথম ধারাবাহিক সুদীর্ঘ লেখা 'দেশ' পত্রিকায় সঞ্জয় ছদ্মনামে, 'জীবিকার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গ' পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত । 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত গল্প— 'চকমকি' । এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের কয়েকটি— শ্বেতপাথরের টেবিল, পায়রা, সোফা-কাম-বেড, ক্যাঙ্গার, শাখা-প্রশাখা, তৃতীয় ব্যক্তি, শঙ্খচিল, বুদবুদ, অবশেষ, দুই মামা, নবেন্দুর দলবল, মনোময় ।
দুটি সাহিত্য পুরস্কারে পুরস্কৃত । ১৯৮১ সালে পেয়েছেন 'আনন্দ পুরস্কার' ।

প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী